10

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

১২৯

মাসিক সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

৩৮ তম সংখ্যা এপ্রির্ল'১০

Pdf by Masum Billah Sunny
sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

ষাট গোম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট, খুলনা।

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : http:// Sunnibarta.wordpress.com

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক সুন্নীবার্তা SUNNI BARTA ১২৯

১২.০০ টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রহঃ)
এম.এম-এম.এ-বিসিএস

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ আজহারী
মোবাইল ঃ ০১৭১১৪৬৪৫৩৭

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল
প্রকাশনা সম্পাদক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৪০৪৭৬৬

নির্বাহী ও সার্কুলেশন সম্পাদক
মোহাম্মদ আব্দুর রব
অর্থ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
যুগ্ম-পরিচালক (অবঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা
মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
E-mail:sunnibarta11@yahoo.com

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা

প্রশ্ন উত্তর ও ফতোয়া বিভাগ
মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ
অধ্যক্ষ আল্লামা শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী
পীরে তরীকত হাফেয মাওলানা আবদুল হামিদ আল-কাদেরী
পীরে তরীকত আল্লামা আবুল বশর আল কাদেরী
অধ্যাপক আলহাজ্ব এম.এ. হাই
ড: আজিজুর রহমান চৌধুরী
ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন
পীরে তরীকত মানযুর আহমেদ রেফায়ী
পীরে তরীকত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম

সহযোগিতায়
কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী, আলহাজ্ব মাওলানা সেকান্দার হোসেন আল-কাদেরী, মাওলানা আবু সুফিয়ান আবেদী আল-কাদেরী, এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী, অধ্যক্ষ ড: এম.এম. আনোয়ার হোসাইন এ্যাডভোকেট, মুহাম্মদ জামাল মিয়া, মুহাম্মদ আবদুল মতিন, মুহাম্মদ হাশেম, আমিনুল ইসলাম তালুকদার, আবুল হোসেন, নূরে আলম, শাকের আহমদ, আবুল হাশেম, আবদুল আজিজ, আবদুল মালেক, মৌলভী মোহাম্মদ আবুল খায়ের , আবু তাহের, মহিউদ্দীন, আবু সাঈদ।

সৌজন্য হাদিয়া ঃ
বাংলাদেশ (প্রতি কপি) ১২ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য (বার্ষিক) £ 2.00
যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক) $ 24.00
সৌদীআরব (বার্ষিক) S.R. 48.00
কুয়েত (বার্ষিক) Dinar 12.00
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (বার্ষিক) Euro 15.00

প্রচারে ঃ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

Pdf by Masum Billah Sunny
sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ..... - ০২

জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন - ০৩

বিনা প্রয়োজনে মাথা মুন্ডানো খারেজীদের আলামত ..... - ০৭

দুরুদ ও মিলাদ পাঠে অন্তরে প্রশান্তি মেলে - ১০

নবীজীর সাথে বেয়াদবী করলে সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে ..... - ১২

ওহাবীদের প্রতি নসীহত ..... - ১৪

প্রচলিত তাবলীগ জামাত ও কিছু কথা - ১৮

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (রহঃ) - ২০

যৌতুক ও ইসলাম ঃ একটি পর্যালোচনা - ২৩

সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ..... - ২৬

সংগঠন সংবাদ ..... - ২৭

প্রশ্নোত্তর ..... - ২৮

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ০০৫০১২১০০১০৫৩৪১ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক ঃ বার্ষিক-£12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক ঃ (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 00501210010534 1
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ
সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

সম্পাদকীয়

সুন্নীয়তই হোক পীর মাশায়েখদের ঐক্যের মূলমন্ত্র

পর্যবেক্ষক মহলের দাবী বাংলাদেশের ৯০% লোক নবী প্রেমিক এবং সহজ সরলভাবে মিলাদ কিয়ামকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে। কারণ, যে সমস্ত পীর-আউলিয়া, দরবেশ ও মাশায়েখরা এদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন তাঁরা সবাই ছিলেন সুন্নী এবং তাঁরাই এতদ অঞ্চলে মিলাদ কিয়ামের প্রচলন করে গেছেন। তাইতো আপনার মুরব্বীদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন- আজ থেকে ৪০/৫০ বছর পূর্বেও বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মিলাদ কিয়াম ছিল কিনা একবাক্যে জবাব মিলবে, মিলাদ-কিয়াম হতনা এমন কোন এলাকা বাংলাদেশে নেই। এদেশের ইসলাম প্রচারে যাঁদের অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাঁরা একদিকে যেমন ছিলেন উঁচু মাপের অলিআল্লাহ পাশাপাশি ছিলেন জগত বিখ্যাত আলেম, মুহাদ্দিস, মুফতী এবং মুফাসসির। তাঁরা পবিত্র কুরআন-হাদীস ভালভাবে বুঝে-সুঝেই সুন্নীয়তের আকীদা লালন করতেন। আর তারই ধারাবাহিকতায় মিলাদ-কিয়ামের মত একটি নবী প্রেমের বেহেশতী নিদর্শন মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা গেল এমন মীমাংসীত একটি বিষয় মিলাদ-কিয়ামকে হঠাৎ করে ২০/৩০ বৎসরের মধ্যে নামধারী কিছু আলেম বিতর্কিত করে তোলার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছে। মজার ব্যাপার এরা যে সমস্ত ওস্তাদের কাছে লেখাপড়া করেছেন তারাও মিলাদ-কিয়াম করতেন। মিলাদ-কিয়ামে বিশ্বাসী ওস্তাদের কাছে লেখাপড়া শিখে মিলাদ বিরোধী ফতোয়া বের হওয়া নিঃসন্দেহে রহস্যজনক। এখানে ইহুদী-নাছারা তথা বিজাতিদের কোন গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে কিনা তা দেখার বিষয়। আখেরী যুগে মুসলমানরা টাকা পয়সার লোভে পড়ে নিজেদের ঈমান বিক্রি করার ভবিষ্যত বাণী কিন্তু স্বয়ং নবীজি দেড় হাজার বছর আগেই করে গিয়েছিলেন।

বাস্তব সত্য হলো, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যুগে যুগে ছিল; এখনো আছে। থাকাটা বিচিত্র নয়। তবে দুঃখ তাদের জন্য যারা এ ষড়যন্ত্রের ক্রিড়নক হিসেবে কাজ করছে।

আশার কথা হলো, বাতিল পন্থীরা যতই ষড়যন্ত্র করুকনা কেন আমাদের এই দেশে সুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা এখনো তাদের চেয়ে অনেক বেশী; তবে বিচ্ছিন্ন। শুধুই বিচ্ছিন্নতা আর অনৈক্যের কারণে এতবিশাল জনগোষ্টির কোন মূল্যায়ন না সামাজিকভাবে হচ্ছে, না সরকারীভাবে হচ্ছে। এতদ অঞ্চলে সুন্নী পীর-মাশায়েখ আউলিয়া কেরাম যাঁরা ইসলাম প্রচারে রাতদিন পরিশ্রম করছেন। তাঁদের উত্তরসুরী এবং মুরীদানরা যদি আরো একটু উদার হয়ে ঐক্যের প্রাচীর গড়ে তোলে তাহলে আগামী কাল সূর্য ওঠার পর পরই প্রশাসনের টনক নড়বে। আর বাতিলরা পালাতে বাধ্য হবে। যে সব উপাদান নিয়ে বাতিলরা এগিয়ে যাচ্ছে সকল উপাত্ত উপদান সুন্নীদের যে নেই; এমনটি নয়। বরং সবই আছে। প্রয়োজন কেবল ঐক্যের মন্ত্রে শামিল হওয়া। বর্তমানে সুন্নী মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততার সুযোগ গ্রহণ করছে বাতিলপন্থী জামাতী, ওহাবী, তাবলীগিরা। তাই আর বিচ্ছিন্নতা নয়। আসুন ঐক্যের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করি- সুন্নীয়তে বিজয়। উড়িয়ে দেই শানে রিসালাত আর শানে বেলায়াতের বিজয় কেতন।

জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

(১২৮ এর পর)

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ (٤٥) اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (٤٦)

সরল অর্থ ঃ (৪৫) "আর তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন- কিন্তু বিনয়ীদের জন্য তা কঠিন নয়- (৪৫) যারা বিশ্বাস করে তারা তাদের পরওয়ারদিগারের সাথে সাক্ষাৎকারী এবং তারা তাঁরই কাছে পূনঃ প্রত্যাবর্তনকারী"।

যোগসুত্র ঃ

(১) অত্র আয়াত দুটিতে বণী ইসরাঈল পণ্ডিতদেরকে সম্বোধন করে ধৈর্য ধারন ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দেয়া হচ্ছে। পূর্ব আয়াতে ছিল নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ। এটা ছিল তাদের পক্ষে খুব কঠিন বিষয়। অতএব অত্র আয়াতে উক্ত কঠিন কাজগুলোই কিভাবে সহজতর হতে পারে- তার ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- ডাক্তার তিক্ত ঔষধ সেবন করার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে সাথে সাথে বলে দেন- সামান্য চিনি মিশিয়ে খেলে তিক্ত মনে হবেনা।

(২) পূর্ব আয়াতে রোগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে আল্লাহ্পাক অত্র আয়াতে ঐ ব্যবস্থাপত্রকে সহজতর করার পরামর্শ এভাবে দিচ্ছেন- আল্লাহ্র কাছে বিনয়ী হওয়া, তাঁর দরবারে ফিরে গিয়ে সাক্ষাৎ করার বিশ্বাস রাখা- এই দুই গুন অর্জন করতে পারলে ঔষধ খাওয়া খুবই সহজ হবে। শক্তিহীন রোগীকে অপারেশন করতে হলে প্রথমে মর্ফিয়া ব্যবহার করা হয়- যাতে সে অপারেশনের যন্ত্রনা টের না পায়। তদ্রুপ নামায কায়েম করা এং বিপদে ধৈর্য ধারণ করা কঠিন কাজ। অতএব এই যন্ত্রনা লাঘবের জন্য আল্লাহ্র ভয়, দীদারের তামান্না ও তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করার ধ্যান করলে নামায ও ধৈর্যধারন অতি সহজ হয়ে যাবে। উল্লেখযোগ্য- যদিও আয়াতের শানে নুযুল খাস- কিন্তু হুকুম আম। অতএব আয়াতে মুসলমানগণও শামিল।

খোলাসা তাফসীর ঃ

বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্পাক আখেরী নবীর উম্মত হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়ায় এটা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন মনে হয়েছিল। কারণ, এক নবী এক কিতাব ও এক বিধি বিধান ত্যাগ করে অন্য নবী, অন্য কিতাব ও অন্য বিধি বিধান মানা খুবই কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজকে সহজতর ও সহনীয় করে তোলার জন্য এবার আল্লাহ্পাক তাদেরকে একটি পন্থা বাত্লিয়ে দিচ্ছেন। তাহলো- নামায ও ধৈর্য ধারন করার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে ঐ সহজতর করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। ত্যাগ করার মত মনোবল পাওয়া যায় ধৈর্যের মাধ্যমে। ধৈর্য ধারনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে নূতন কাজকে অতি কঠিন বলে মনে হয়। আবার ধৈর্য ধারনের জন্য নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়া হলো ফলদায়ক। যত কঠিন মুসিবতই হোকনা কেন- নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ঐ মুসিবত হাল্কা হয়ে যায়। ধৈর্য ক্ষমতা বেড়ে যায়। তবে নামায ও ধৈর্য ধারন- উভয়টিই খুব কঠিন কাজ। অতএব এই কঠিন কাজগুলো সহজ ও হাল্কা করার জন্য আল্লাহ্র কাছে বিনয়ী হতে হবে এবং আল্লাহ্র দীদারের কথা স্মরন করতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে শেষ প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী হতে হবে।

নামায কঠিন মনে হওয়ার কারণ হলো- শরীর থাকে নামাযে- কিন্তু মন থাকে বাজারে ও বাইরে। বহ্যিক ভাবে খাওয়া দাওয়া, হাসি তামাশা ত্যাগ করে নামাযে দাঁড়ালেও মন কিন্তু চলে যায় বাইরে। এতে বান্দার মন নামাযে ছটফট করে। নামাযে মন বসেনা। তাই নমাযে বাহ্যিক কাজ কর্মের সাথে সাথে খুশু খুজু বা বিনয় এবং আল্লাহ্র দীদারের খেয়াল করার নির্দেশ এসেছে। যদি এই অভ্যাস করা যায়- তাহলে নামাযে স্বাদ পাওয়া যাবে। তখন আর মন ছটফট করবেনা- এবং নামাযকে

ভারী মনে হবেনা। তখন নামাযই হবে তার কাছে স্বাদের বস্তু। এজন্যই হাদীসে জিব্রীল -এর মধ্যে এসেছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো- যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। আর যদি একান্ত এ খেয়াল ও ধ্যান না আসে- তাহলে অন্ততঃ মনে করো- আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন- তিনি হাযির নাযির"। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ হাহুর পায়ে তীর বিধেঁ গিয়েছিলো। ব্যাথায় তিনি অস্থির। কেউ তাঁর তীর খুলতে পারছিলোনা। তিনি বললেন- আমি নামাযে দাঁড়ালে তোমরা আমার তীর খুলে নিবে- আমি টের পাবোনা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) -এক প্রিয় পুত্র মারা যাওয়ার সংবাদে তিনি তাড়াতাড়ি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌র ধ্যানে ডুবে গেলেন। জানাযা শেষে লোকেরা জানাযায় শরিক না হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন- ছেলেটি আমার অতি প্রিয় ছিল। তার মৃত্যুশোক আমার সহ্য হচ্ছিলনা। তাই নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ধৈর্য প্রার্থনা করেছি।

শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

(১) অত্র আয়াত দ্বরা বুঝা গেল- ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে অনেক বড় বড় মুসিবতের সমাধান হয়ে যায়। তাফসীরে আযীযীতে শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহঃ) একটি হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন- "ইলেম মুসলমানদের বন্ধু, সহনশীলতা তার উজির, বিবেকবুদ্ধি তার পথচালক, বিনয় ও আজেযী তার ভাই এবং ধৈর্য তার সেনাপতি। সেনাপতি ব্যতিত যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব। তদ্রূপ ধৈর্য ব্যতিত বিপদ উত্তরণও অসম্ভব।

(২) দুনিয়ার কাজকর্মে ও অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। ব্যবসায়ীর মূল পুঁজি হলো ধৈর্য্য। লোকসানে ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। এজন্যই অত্র আয়াতে ধৈর্য্য শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দুনিয়া হোক, আখেরাত হোক- সব কাজে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। ধৈর্য্য আর নামায হলো কামিয়াবীর মূল চাবিকাঠি।

(৩) আমলের দ্বারা দোয়া করলে সহজে কবুল হয়। এজন্য কিছু আমল করে যিকির আযকার ও নামায পড়ে দোয়া করলে সহজে কবুল হয়।

(৪) মুসলমানরা পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার পাবে। কেননা, অত্র আয়াতে নামাযী ও ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র মোলাকাত পাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

(৫) নামাযকে কঠিন ও ভারী মনে করা মোনাফেকের আলামত। হাদীসে এসেছে- এশা ও ফজর নামায মুনাফিকদের জন্য খুবই কঠিন। আল্লাহ্ পাক বলেন- "মুনাফিকরা যখন নামাযে দাঁড়ায়- তখন তারা অমনোযোগী হয়ে দাঁড়ায়। তারা শুধু মানুষ দেখানো নামায পড়ে। তারা আল্লাহ্‌র যিকিরে মনোযোগী হয়না"। (ছুরা নিসা)।

কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ

প্রথম প্রশ্ন ঃ অত্র আয়াতে বুঝা যায়- নামায মুসলমানদের জন্য সহজ- কিন্তু অমুসলিমদের জন্য কঠিন। অতএব অমুসলমান ও মুনাফিকদের সাওয়াব বেশী হওয়া উচিৎ। কেননা, বেশী ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

উত্তর ঃ আয়াতের মর্ম হলো- মুসলমানদের জন্য কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। সুতরাং তাদেরই বেশী সাওয়াব হবে। মুনাফিকরা সাওয়াবের আশা-ই করেনা, বেশী হবে কি করে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ অত্র আয়াতে বলা হয়েছে- "তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে"। বুঝা গেল- আল্লাহ্‌র স্থান আছে।

উত্তর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাওয়ার অর্থ স্থানে নয়- বরং আল্লাহ্‌র শক্তির কাছে। সেদিন আল্লাহ্ হবেন সর্বশক্তিমান। দুনিয়াতে অন্য বাদশাহ্ আছে- কিন্তু আখেরাতে কোন বাদশাহ্ থাকবেনা। একমাত্র থাকবে খোদার রাজত্ব। ঐ রাজত্বেই ফিরে যেতে হবে।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ اِلَيْهِ দ্বারা বুঝা যায় শেষ গন্তব্য। শেষ গন্তব্য বলতে বুঝায় সশরীরী সত্ত্বা। তাই আল্লাহ্‌ও শরীরী স্বত্ত্বা।

উত্তর ঃ আল্লাহ্ সশরীরী সত্ত্বা নন। শেষ গন্তব্য -এর সত্ত্বা হওয়া জরুরী নয়। বলা হয়ে থাকে- "প্রত্যেক বস্তুই তার মূলের দিকে ফিরে যায়"। মূল হলো অবস্থার নাম। অবস্থা সশরীরী সত্ত্বা নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো শেষ গন্তব্য।

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তন করা দ্বারা বুঝা যায় রূহ্ যেখানে ছিল- সেখানে ফিরে যাবে। এতে বুঝা যায়- রূহ্ অবিনশ্বর বা কাদীম।

উত্তর ঃ রূহ্ প্রথমে আলমে আর্ওয়াহে্ ছিল- সেখানে পূনঃ ফিরে যাবে- ঠিক, কিন্তু আলমে আর্ওয়াহ্ তো সৃষ্টি। সুতরাং অবিনশ্বর নয়।

ষষ্ঠ রুকু শুরু ঃ

يٰبَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٤٧)

সরল অর্থঃ (৪৭) "হে ইয়াকুবের বংশধরগণ! তোমরা আমার ঐসব নেয়ামতের কথা স্মরণ করো- যা আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে দান করেছি এবং আমি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের উপর প্রাধান্য দান করেছি"।

যোগসূত্র ঃ

পূর্ব রুকুতে বণী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেছেন- তোমাদেরকেই আমি বিশেষ নেয়ামত দান করেছি। অতএব, তোমরা আমার সাথে তোমাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করো, আখেরী নবীর উম্মত হয়ে নামায পড়ো, যাকাত দাও। অত্র রুকুর শুরুতে বর্ণনা করা হচ্ছে আরো বড় নেয়ামতের কথা। তা হলো- বিশেষ নেয়ামত প্রদান এবং সারা বিশ্বের উপর তাদের মর্যাদা ও প্রাধান্য। সুতরাং, তাদের শুকরিয়ার সাথে এগুলো স্মরণ করে বর্তমান নবীর উপর ঈমান এনে সেগুলোকে ধরে রাখা উচিত।

খোলাসা তাফসীর ঃ

হে বনী ইসরাঈল! আমি আল্লাহ্ তোমাদেরকে এতদিন ধরে যেসব নেয়ামত দান করে এসেছি- সেগুলোকে শুকরিয়ার সাথে স্মরণ করো। তোমাদের বংশে ৭০ হাজার পয়গাম্বর প্রেরণ করেছি। তোমাদের মধ্যে অনেক বিশ্ব বিখ্যাত বাদশাহ্ প্রেরণ করেছি এবং অন্যদেরকে যা দেয়নি- তা তোমাদেরকে দিয়েছি। রাজ্য দিয়েছি, রাজত্ব দিয়েছি, মান্না ছাল্ওয়া দান করেছি, তিহ্ ময়দানে মেঘমালা দিয়ে ছায়া দিয়েছি, নীল দরিয়া পার করে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছি। সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো- সারা বিশ্বের উপর তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছি। ঐসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা তোমাদের উপর ফরয। এখন সে সময় এসে গেছে। আখেরী নবী এবং আখেরী কিতাব প্রেরণ করেছি। তোমরা সম্মিলিতভাবে এই নবীকে মেনে নাও এবং এই কিতাবের বিধানমতে জীবন পরিচালিত করো।

শিক্ষনীয় কিছু বিষয় ঃ

(১) বংশীয় মর্যাদা আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত। নবীগণের বংশধর হওয়া বড় মর্যাদার কথা। সুতরাং শুধু মোত্তাকীর চেয়ে সাইয়েদ মোত্তাকী এবং শুধূ আলেমের চেয়ে সাইয়েদ আলেম, শুধূ পীরের চেয়ে সাইয়েদ পীর অনেক বেশী মর্যাদাবান। অনুরূপভাবে, কোন সাইয়েদজাদা যদি অপরাধ করে- তাহলে অন্যান্য অপরাধীর মত তার সাথে ব্যবহার করা যাবেনা। সাধারণ পরহেযগার আর সাইয়েদ পরহেযগারের মধ্যে অনেক অনেক ব্যবধান। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "মৃত্যুর সাথে সাথে সবার বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়- কিন্তু আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবেনা"। কেয়ামতের দিনে কারো বংশীয় মর্যাদা কাজে আসবেনা। কিন্তু নবীজীর আওলাদের বংশীয় মর্যাদা কাজে আসবে। নবীজীর আওলাদগণের পৃথক মর্যাদা হবে হাশরের দিনে। কেউ কেউ বলে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- لااغنى عليكم من الله شيأ অর্থাৎ "হে আমার বংশধরগণ! পরকালে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিত রক্ষা করতে পারবোনা"। এতে বুঝা যায় নবীজীর বংশীয় মর্যাদা কাজে আসবেনা। তাদের এই দলীলের উত্তর হলো- "বিনা ঈমানে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারবোনা"। হ্যাঁ, ঈমানদার হলে শুধূ রক্ষা নয়- বরং বিভিন্ন সরদারী দান করা হবে। মা ফাতেমা (রাঃ) হবেন জান্নাতী মহিলাদের সর্দার। হযরত আলী (রাঃ) হবেন হাউযে কাউছারের দায়িত্ব প্রাপ্ত। যাদের হাতে গোটা জান্নাতের সর্দারী- তাঁদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্ষা করতে পারবেনা বলে যারা দাবী করে, তারা এক হাদীসের মুনশী। তারা ঐ একটি হাদীস দেখলো- আর এতগুলো হাদীস দেখলোনা? তারা অন্ধ ও নবী বিদ্বেষী-

এতে সন্দেহ নেই। এজন্যই কোন সাইয়েদযাদার সাজা হলে এই নিয়তে সাজা দিতে হবে যে, তাঁর কাপড়ের ময়লা সাফ করে তাঁকে পাক পবিত্র করা হচ্ছে। (শামী)

(২) সমস্ত মর্যাদা ও সম্মান ঈমানের কারনে বহাল থাকে। ঈমানহারা হয়ে গেলে যাবতীয় মর্যাদা ও সম্মান চলে যায়। যেমন চলে গিয়েছে ইয়াহুদীদের। বেঈমান হয়ে গেলে সাইয়েদযাদা হলেও দোযখ থেকে রক্ষা পাবেনা। যথা- কেন্আন হযরত নূহ্ নবীর বেটা হওয়া সত্ত্বেও বেঈমানীর কারনে ডুবে মরেছে এবং জাহান্নামী হয়েছে। এতে একটি মাসআলা পরিষ্কার হয়ে গেলো- নবী বংশীয় হয়েও যারা শিয়া, খারেজী, দেওবন্দী, কাদিয়ানী হয়ে গেছে- এখন সাইয়েদ তো দূরের কথা মুসলমানই নয়। তাদেরকে সাইয়েদ বলা যাবেনা। কেননা, সাইয়েদ হওয়ার জন্য শর্ত হলো ঈমানদার থাকা। এরা এখন আর ঈমানদার নয়- সুতরাং সৈয়দও নয়। দেখুন- বণী ইসরাঈলগণ নবীযাদা হয়েও বর্তমানে কাফের। কেননা, তাদের ঈমান নেই।

(৩) ইসলামের ইতিহাস জানা খুবই জরুরী। ইতিহাস না জানলে অতীত ঘটনা সম্পর্কে অন্ধ থাকবে। এই সুযোগে বাতিলপন্থীরা ধোঁকায় ফেলে দিবে।

(৪) খোদার নেয়ামত প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিজ বংশীয় বুযুর্গ ব্যক্তিদের ধর্মীয় ফযিলত বর্ণনা করা জায়েয। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের শান বয়ান করা খুবই উত্তম। আল্লাহ্ পাক বলেন- وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "হে রাসূল! আপনার প্রতি আপনার প্রভূর নেয়ামত সমূহের খুব চর্চা করুন"।

(৫) কোন বুযর্গ ব্যক্তির স্মরণসভা করাও উত্তম। কেননা, এতে খোদার নেয়ামতের চর্চা করা হয়। বুযুর্গানেদ্বীনের উরছ, সন্তানের জন্ম বার্ষিকী, বিশেষ পদ মর্যাদা লাভে মাহফিল করা ও শুকরিয়া আদায় করা অত্র ৪৭ নং আয়াতের অন্তর্ভূক্ত।

কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ

প্রথম প্রশ্ন ঃ আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল- সমস্ত বণী ইসরাঈল সমগ্র বিশ্বের উপর মর্যাদাবান। তাহলে কারুন, ছামেরী, অন্যান্য গযবপ্রাপ্ত বনী ইসরাঈল তারাও কি উক্ত মর্যাদায় মর্যাদাবান?

উত্তর ঃ এখানে জাতি হিসাবে মর্যাদাবান- ব্যক্তি হিসাবে নয়। সুতরাং, প্রত্যেকের মর্যাদাবান হওয়া জরুরী নয়। যেমন পুরুষ জাতি নারীজাতির উপর মর্যাদাবান। তাই বলে ফেরাউন মুসলমান নারীর উপর মর্যাদাবান হতে পারেনা। জাতিবাচক বিশেষ্যর এটাই নিয়ম।

কিছু শাব্দিক বিশ্লেষন ঃ

(১) عَلَى الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ- সমগ্র বিশ্বের উপর বণী ইসরাঈলের মর্যাদা। এর অর্থ এ নয় যে, এখনও তাদের সে মর্যাদা রয়েছে। বরং বর্তমানে তারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট জাতি। কেননা, তাদের নিজস্ব কোন ভূখণ্ড নেই। লাঠির জোরে ও আমেরিকার সহযোগিতায় ফিলিস্তিনিদের আবাসভূমি জবর দখল করে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে ইহুদীরা এসে লাঠির জোরেই টিকে আছে মাত্র। তাদের সার্বভৌমত্ত দুনিয়াবাসী স্বীকার করেনি। তবে তাদের পিতৃপুরুষরা ঐ যুগের সমগ্রবিশ্বের উপর মর্যাদাবান ছিল। আলামীন শব্দের দুই অর্থ আছে। একটি হলো আল্লাহ্ ছাড়া সবার উপর মর্যাদাবান। আরেক অর্থ হলো অন্য জাতি হতে উত্তম। এই শেষ অর্থেই আলামীন ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলমানদের তুলনায় তারা উত্তম নয়। কেননা, মুসলমানদের শানে আল্লাহ্পাক বলেছেন- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ তোমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের চেয়েও উত্তম। তাহলে বনী ইসরাঈলের নবীগণ ছাড়া তারা অন্যান্য মুসলমানদের তুলনায় তখনও অধম ছিলো; এখনও এবং কিয়ামত পর্যন্ত অধম থাকবে।

(২) اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপর আমি বিশেষ বিশেষ নেয়ামত প্রদান করেছি। এর মধ্যে ৭০ হাজার নবীর আগমন, ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রেহাই প্রদান, নীল দরিয়া অতিক্রম, ময়দানে তীহে ৪০ বৎসর অবস্থান, মেঘমালার ছায়াদান, শাহী খানা মান্না ছাল্ওয়া প্রদান, রাজ্য ও রাজত্ব প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। *(চলবে)*

বিনা প্রয়োজনে মাথা মুন্ডানো খারেজীদের আলামত

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى ﷺ عَنِ النَّبِى ﷺ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ. ثُمَّ لَايَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتّٰى يَعُوْدُ السَّهْمُ اِلٰى قَوْسِهِ قِيْلَ مَاسِيْمَاهُمْ؟ قَالَ سِيْمَاهُمْ اَلتَّحْلِيْقُ اَوْ قَالَ اَلتَّسْبِيْدُ.

অনুবাদ ঃ হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু তা'লা আনহু হতে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "পূর্বাঞ্চল হতে কিছু লোক বেরুবে। তারা কুরআন পড়বে বটে, (তবে) কণ্ঠনালীর নিচ (অন্তর) অতিক্রম করবেনা। তারা ধর্ম হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেখানে ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তীর যেমন ধনুকে পুনরায় ফিরে আসেনা তেমনি এরাও ধর্মের মধ্যে আর ফিরে আসবে না।" (নবীজীর দরবারে) আবেদন করা হল-ওই সমস্ত লোকের চিহ্ন কী (তাহাদেরকে চেনার উপায় কী?) নবীজী বললেন,– "তাদের চিহ্ন হল, মাথা মুন্ডানো"। অথবা বলেছেন-"মাথা মুন্ডিয়ে রাখা"।

(সূত্র ঃ সহীহ বুখারী : কিতাবুত তাওহীদ হাদীস নম্বর ৭১২৩, সহীহ মুসলিম কিতাবুয যাকাত হাদীস ১০৬৮, মুসনাদে আহমদ; হাদীস নম্বর ১১৬৩২. মুসান্নাফে আবী শাইবা : হাদীস নম্বর ৩৩৯৭, তাবরানী : ৬ষ্ঠ খন্ড ৯১ পৃষ্ঠা : হাদীস নম্বর ৫৬০৯।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিশ্বের কালজয়ী আদর্শ এবং মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের শত্রুরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য শত্রুদের নাম কাফির আর দ্বিতীয়টির নাম মুনাফিক। প্রকাশ্যচক্র কাফিরদের চেয়ে বহুগুণে মারাত্মক হল মুনাফিকচক্র। এদের বেশভূষা দর্শনে সাধারণ মুসলমান বিভ্রান্তির ইন্দ্রজালে আটকা পড়ে নিজের মূল্যবান ঈমান-আক্বীদা হারিয়ে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। মুনাফিকচক্রের জন্ম কেবল আজকালকার নয়। বরং রসূলুল্লাহর উপস্থিতিতে এদের দুঃসাহসিক পদচারণা লক্ষণীয়। মসজিদে নববীতে বসে অস্বাভাবিকভাবে বেশি চোখের পানি যে ব্যক্তি ফেলত সেও ছিল মুনাফিক। আর নবীজর নবুয়তের রাডারকে ফাঁকি দেয়ার ক্ষমতাতো অন্তত তাদের ছিলনা। তাই কৌশলগত কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তাদেরকে জনসম্মুখে চিহ্নিত না করলেও সময়মত তাদের নাম ধরে ধরে মসজিদ হতে বের করে দিয়েছিলেন স্বয়ং নবীজী।

নবীজী এরশাদ করেছেন-বণী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটিমাত্র দল ছাড়া বাকি সবাই যাবে জাহান্নামে। সাহাবীরা নাজাতপ্রাপ্ত (মুক্তিপ্রাপ্ত) দলের নাম জানতে চাইলে তিনি বললেন, যে দলে আমি আছি এবং আমার সাহাবীরা রয়েছে। - মিশকাত ৩০ পৃষ্ঠা।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিরকাত কিতাবে লিখেছেন-এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নাম হচ্ছে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"। হযরত গাউসুল আ'যম আব্দুল কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন তারা হল 'সুন্নী'। সুতরাং সুন্নী মুসলমান তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র বিপরীতে যতদল মতাদর্শী রয়েছে নিঃসন্দেহে তারা ভ্রান্ত, গোমরাহ তথা পথভ্রষ্ট।

ইসলামের নামে সৃষ্ট বাতিল দলসমূহের অন্যতম খারেজী ফিরকা। আলোচ্য হাদীসে সেই ঘৃণ্য মতবাদের একটি উল্লেখযোগ্য আলামত উল্লেখ করে দিয়ে নবীজী পরবর্তী উম্মতদেরকে সতর্ক দিয়ে দিয়েছেন, যেন এদের সংশ্রব থেকে সুন্নী মুসলমানরা দূরে থেকে নিজেদের ঈমান আক্বীদা সংরক্ষণ করতে পারে। আর সেই আলামত হল বিনা কারণে উপর্যুপরী মাথা মুন্ডানো। মুসলমান নামধারী একশ্রেণীর মানুষ এখানে লক্ষ্য করা যায়, যারা বিনা প্রয়োজনে মাথা মুন্ডিয়ে ফেলে, এমনকি অন্যদেরকেও মাথা মুন্ডানোর ব্যাপারে জোর তাকীদ দেয়। এরা কেবল এ যুগের সৃষ্ট নয়; যুগ যুগ ধরে এরা ছিল। এদের

বিধবংশী আক্বীদা ও হিংস্র মনোভাব দর্শনে প্রতিটি মসলমানের শরীর শিহরে ওঠে। এরা খারেজী মতবাদের অনুসারী; এদের প্রবর্তক 'যুল খুয়াইসেরা' নামক এক ব্যক্তি। সে নবীজীর ন্যায়বিচারের (ইনসাফ) উপর আপত্তি করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত অপর হাদীসে রয়েছে-একদা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামেন হতে কিছু স্বর্ণের টুকরো নবীজীর খিদমতে পাঠালে ওই স্বর্ণগুলো নবীজী উপস্থিত চারজন সাহাবীর মাঝে বন্টন করে দেন। এতে একলোক বলল, এর হকদার আমরাও তো ছিলাম। এ কথা নবীজীর কানে পৌছলে তিনি বললেন-তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে করোনা? অথচ আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত আমাকে 'আমীন' বলে জানে। অতঃপর একলোক দন্ডায়মান হল, যার চক্ষুযুগল ছোট ছোট গর্তের মত ভিতরে ঢুকানো, মুখের চোয়াল ফুলানো, কপাল উঁচু, ঘনশ্মশ্রুমন্ডিত আর মাথাটা ছিল সম্পূর্ণ মুন্ডানো; সে বলল-হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। তার দুঃসাহসিক কথা শুনে নবীজী বললেন, তুমি ধবংস হয়ে যাও। আমি কি আল্লাহকে দুনিয়ার সব লোকের চেয়েও বেশি ভয়কারী নই? অতঃপর লোকটি যখন মজলিস হতে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি এ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেবনা? নবীজী তাঁকে বারণ করলেন এবং বললেন, সম্ভবত: সে নামায পড়ে। খালেদ বিন ওয়ালিদ বললেন-এ ধরনের নামাযী তো অনেক রয়েছে যাদের মুখের সাথে অন্তরের মিল নেই।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন,যখন সে ফিরে তাকাল তখন নবজী তার প্রতি দৃষ্টি নক্ষেপ করে বললেন-

এ লোকের ঔরশে এমন কিছু লোক জন্ম নেবে যারা কোরআন তিলাওয়াতে সব সময় মুখ ভিজিয়ে রাখবে ঠিকই কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে নিচের (কলবের) দিকে যাবে না। এরা দ্বীন, ধর্ম থেকে এমনিভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক হতে তীর বের হয়ে যায় আর ফিরে আসেনা।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত নবীজী এও বলেছিলেন যে, "তোমরা এদেরকে পৃথিবীর বুকে যেখানে পাও সামুদ গোত্রের মত হত্যা কর।"

দ্রষ্টব্য- (বুখারী শরীফ: কিতাবুল মাগাযী, মুসলিম শরীফ: কিতাবুয যাকাত, মুসনাদে আহমদ. সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আবি ইয়ালা, হিলিয়াতুল আউলিয়া, ফাতহুল বারী কৃত ইমাম আসক্বালানী, আদ দীবাজ : কৃত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী।

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, অপর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, একদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় 'যুল খুয়াইসেরা' নামক এক ব্যক্তি বলে ওঠল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ইনসাফ (ন্যায়বিচার) করবেন। এ কথা শুনে নবীজী বললেন, তোমার ধবংস হোক। আমি ইনসাফ না করলে দুনিয়াতে আর কে ইনসাফ করবে? এদকিে হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে আবেদন করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দিই। নবীজী তাঁকে বারণ করে বললেন, তার কিছু অনুসারীও রয়েছে। তারা এতবেশী নামায পড়ে যে, তাদের নামাযের সামনে তোমরা তোমাদের নামাযকে অতি নগণ্য মনে করবে। তারা এতবেশী রোযা রাখে যে, তাদের রোযার সামনে তোমাদের রোযা যেন কিছুই না। অথচ তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক হতে বের হয়ে যায়।

সহীহ বুখারী : কিতাবুল আদব : হাদীস ৫৮১১, সহীহ মুসলিম : বাবু যিকরিল খাওয়ারেজ

এভাবে প্রসিদ্ধ সকল হাদীসের কিতাবে খারেজীদের আলামত ভ্রান্ত আক্বীদা ও চরিত্র সম্পর্কে উল্লেখ পুর্বক হাদীস শরীফসমূহ সঙ্কলন করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ততার কারণে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব হল না। তবে সংক্ষেপে এতটুকুই বলতে হয়, ইসলামের নামে গজে ওঠা বাহাত্তর বাতিল মতাবাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও মারাত্মাক দল হল-'খারেজী'। এরা দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে চলাফেলা করত, এমনকি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত মাওলা আলী মুরতাজা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করেছিল এরাই। শুধু তা-ই নয়, মা আয়েশা সিদ্দীক্বাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার উষ্ট্রযুদ্ধের সুচনার নেপথ্যে এদেরই ষড়যন্ত্র ছিল বলে ইতহাস সাক্ষ্য দেয়। তদ্রুপ

সিফফীনের যুদ্ধের মূল চালিকাশক্তিও ছিল এদের মুনাফিক্বী। এভাবে ইসলামের সুশোভিত বাগানকে তছনছ করে দিতে চেয়েছিল এই কুখ্যাত খারেজী মতবাদীরা। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন তিনিই হিফাজত করেছেন। আর ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত হয়েছে সে সব বাতিল মতবাদীরা। সবার সামনে উন্মোচিত হয়েছে তাদের মুখোশ। সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করে হাজার হাজার লোক তাদের দলত্যাগ করে ইসলামর সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র পতাকাতলে সমবেত হয়ে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণে সচেনত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইবলিশ শয়তানতো আর বসে নেই। ওই সমস্ত নিগৃহিত অভিশপ্ত খারেজীদেরকে অন্যনামে কীভাবে পৃথিবীর বুকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তার পরিকল্পনা নিয়ে যেন মাঠে নেমেছে।

তাইতো দেখা যায়-খারেজীদের উত্তরসূরী বাতিলপন্থীদের চরিত্র আক্বীদা-বিশ্বাস ও বাহ্যিক লেবাস, লোক দেখানো আমলের বাহার আর অন্তরে নবীবিদ্বেষের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। খারেজীর মত মাথামুন্ডানো তাদের অন্যতম চরিত্র, নবীজীর প্রতি তা'যীম-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যারা শিরক ফতোয়া দেয়, মিলাদ-ক্বিয়ামকে যারা বিদ'আত মনে করে, নবীকে নিজেদের মত সাধারণ মানুষ বলতে যাদের বুক কাঁপেনা, আল্লাহ মিথ্যা বলতে সক্ষম এমন ঈমানবিধ্বংসী আক্বীদা যাদের কলমে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ পায় নবী-রসূল ওলী-আউলিয়াদের শানে অসংখ্য সহীহ হাদীসকে যারা প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহস দেখায়, এরা কারা? মুখে মধু অন্তরে যেন বিষ। কথাবার্তা যাদের নবীদের মত, কাজকর্ম ফিরআউনের মত, আর অন্তর বাঘের ন্যায় হিংস্রতর বলে হাদীসে পাকে নবীজী কি এদের কথাই বলেছিলেন? সত্যিই তো এরা সুন্দর সুরে কোরআন পড়ে, আমলের পাহাড় যেন মাথায়-কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে, শহরে-বন্দরে নগরে নগরে গ্রামে-গঞ্জে। এরা ঘন ঘন মাথা মুন্ডায় কেন? কিংবা এদের মতাদর্শ প্রচারের কেন্দ্র খারেজী (কওমী) মাদারাসার ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে মাথা মুন্ডাতে হয়, পেছনে রহস্য কী? তাহলে কি ওহাবী, খারেজী, কওমী, তাবলীগী কেই সূত্রে গাঁথা এ নবীদুশমনদের অনুসারী? বলতে দ্বিধা নেই, যারা নবীর ইলমকে শয়তান, পাগলের ইলমের সাথে তুলনা করতে পারে নাযাযে নবীজীর খেয়াল আসাকে গরু-গাধার খেয়াল আসার চেয়েও মন্দ বলতে পারে, তাদের মাঝে আর সেই খারেজী মতবাদের প্রবক্তা 'যুল খুয়াইসেরা'র মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বরং সেই অভিশপ্ত 'খুয়াইসেরা'র অসমাপ্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যই এদের আত্মপ্রকাশ।

পরিশেষে, বলতে চাই, বাহ্যিক চাঁকচিক্য ও আমলের বাহার লোক দেখানো লম্বা দাঁড়ি, পাগড়ি, মিসওয়াক ইত্যাদি দেখে কেবল যেন আমরা বিভ্রান্ত না হই; বরং তাদের মৌলিক আক্বীদা কি রসূলের প্রদর্শিত পথে না বিপথে তা যাঁচাই বাছাই করা বর্তমান ফিতনার যুগের প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। 'যে বলে রাম তার সঙ্গে যাম' বলে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। ক্বিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ঈমান ও কৃতকর্মের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সময় থাকতেই সকর্ত হতে হবে। বিশুদ্ধ করে নিতে হবে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা।

কবি নজরুলের ভাষায়-

ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর
তখনো জাগিনি যখন জোহর
হেলা ও খেলায় কেটেছে আছর
মাগরিবের আজ শুনি আজান
জামাতে শামিল হওরে এশাতে
এখনো জামাতে আছে স্থান।

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগদিন

যোগাযোগ :

মোহাম্মদ ফারিজুল বারী

০১৯২১৩০৮০৫৯

মোহাম্মদ বিদ্যুৎ

০১৭১৩৪৩১২৪২

মোহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন

০১৭১৬৫৭৩৩৩৩

দুরুদ ও মিলাদ পাঠে অন্তরে প্রশান্তি মেলে

আলহাজ্ব আল্লামা আবদুল বারী জেহাদী আল মুজাদ্দেদী, লাকশাম, কুমিল্লা

সমস্ত প্রশংসা মহিয়ান গরিয়ান বিশ্বপতির জন্য, যিনি আঠার হাজার মাখলুকাত, আশি হাজার আলম সৃষ্টি করেছেন। সালাতু-সালাম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, যাঁকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ পাক কিছুই সৃষ্টি করতেন না। বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যাঁর আগমন, যিনি মানব জাতির একমাত্র আলোর দিশারী তিনিই আমাদের প্রিয় নবী হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি কোন বিশেষ সমাজ জাতির নিকট প্রেরিত হননি বরং তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশেষ নবী হয়ে। তিনি আগমন করেছেন সমগ্র বিশ্ব বাসীর জন্য রহমাত বা শান্তির দূত হিসেবে তিনি "রাহমাতুল্লিল আলামীন"।

কেয়ামতের কঠিন দিনে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে পাপী-তাপী উম্মতের জন্য শাফয়াত করবেন, তিনি শাফিউল মুজনেবীন। যাঁর শুভাগমনে ধন্য হয়েছে সৃষ্টি জগৎ, যাঁর নূর বা আলোর কিরণে উজালা হয়েছে সমস্ত বিশ্বভূবন, যিনি আগমন করেছেন সারা জাহানের জন্য আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমতের জীবন্ত প্রতীক হয়ে। যিনি বহন করে এনেছেন বিশ্ব মানবের জন্য চিরশান্তি ও চির নাজাতের পয়গাম "আল কুরআন"। যাঁর বদৌলতে বিশ্বজগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাঁর সৌজন্যে বিশ্ব মানবে উচ্চ মর্যাদা সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাঁর তোফায়েলে সমগ্র মানব জাতি লাভ করেছে সরল সঠিক পথ "সিরাতুল মুস্তাকীম" যাঁর আবির্ভাব হয়েছে রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ সুবহে সাদেকের শুভক্ষণে। তাঁর আগমন হয়েছে আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের সুবিখ্যাত কুরাইশ গোত্রে। মানব ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে বিশ্ব মানবের মর্যাদা রক্ষাকল্পে বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব হলো।

প্রিয় পাঠকগণ! আজকাল বিভিন্ন স্থানে বলা হয়ে থাকে, আমাদের নবী চল্লিশ বৎসরে নবুয়ত লাভ করেছেন; তা সত্য নয়। কেননা তিনি স্বীয় জবান মোবারকে বলেছেন, আদম (আঃ) যখন মাটি ও পানির মধ্যে বিরাজমান তখনও তিনি নবী, কিয়ামত দিবসে উম্মতি উম্মতি রবে ক্রন্দন করবেন আর আল্লাহ পাকের দরবারে সমস্ত উম্মতদেরকে শাফায়াত করে চির সুখময় স্থান বেহেস্তে নিয়ে যাবেন। যিনি মউত, কবর, হাশর মিজান ও পুলছেরাতের কান্ডারী সেই মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদ শরীফ ও দুরুদ শরীফ পাঠ করা কতইনা সাওয়াব ও ফজিলতের কাজ। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন স্বয়ং পবিত্র কুরআন পাকে ঘোষণা করেন- "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউছাল্লোনা আলান্নাবী ইয়া আউয়্যু হাল্লাজিনা আমানু ছাল্লো আলাইহে ওয়া ছাল্লেমু তাছলীমা" (সূরা আহজাব, আয়াত-৫৬)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর ফেরেস্তাগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি সালাত ও সালামের হাদিয়া পেশ কর। এই আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দুরূদ শরীফ ও সালাম পেশ করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তাহলো এই যে, পবিত্র কোরআন শরীফের বহু আয়াতে আদেশ রয়েছে এবং বহু আয়াতে নিষেধ রয়েছে। কিন্তু কোন আদেশের সাথে এই ভূমিকা সংযোজিত হয়নি যে, এ কাজ আমিও করছি অতএব তোমরাও কর। এই উচ্চ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য শুধু মহানবী হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যই। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমি প্রিয় নবীর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করি। আমার ফেরেস্তারাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করে। আর হে ঈমানদারগণ! তোমরাও দুরুদ ও সালামের হাদিয়া প্রেরণ করে ধন্য হও। দুরূদ ও সালামের ফজিলত এর চেয়ে আর কি হতে পারে! তাফসীরে রুহুল বায়ান শরীফে লিপিবদ্ধ আছে, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মহান আল্লাহ পাকের দুরূদ প্রেরণের তাৎপর্য হলো তাঁকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছিয়ে দেওয়া তথা মাকামে শাফায়াতে পৌঁছিয়ে দেওয়া আর ফেরেস্তাদের দুরুদের তাৎপর্য হলো-প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উচ্চ মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করার জন্য

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা এবং তার উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। মুমিনদের দুরুদ প্রেরণের তাৎপর্য ও মর্মার্থ হলো-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করা এবং অতুলনীয় গুণাবলী আলোচনা করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাঁর ফেস্তোগণ সেই ব্যক্তির প্রতি সত্তর বার রহমত নাযিল করেন, সুবহানাল্লাহ! হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত ছিলেন তাঁর নূরানী চেহারা মোবারকে আনন্দের ঝলক পরিলক্ষিত হয়েছিল। উপস্থিত লোকেরা আরজি পেশ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নূরানী চেহারা মোবারকে আনন্দের চিহ্ন রয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমাদের ধারনা সঠিক, আমার নিকট রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে পয়গাম এসেছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন- আপনার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ একবার দুরূদ শরীফ প্রেরণ করে আল্লাহ পাক তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার দশটি গুনাহ মাফ করবেন ও দশটি মর্তবা বুলন্দ করবেন। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তির সম্মুখে আমার আলোচনা হয় সে ব্যক্তির কর্তব্য আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করা। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি দুরুদ প্রেরণ করবে আল্লাহ পাক তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ মাফ করবেন ও দশটি মরতবা বুলন্দ করবেন। হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এই আরজী পেশ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি আমার দোয়ার মধ্যে কি পরিমাণ দুরূদ পেশ করবো? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যতুটকু তোমার ইচ্ছা পেশ করতে থাক। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'এক চতুর্থাংশ', হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন তা তোমার ইচ্ছা। তবে এর চেয়ে বেশি পরিমাণ দুরূদ পেশ করা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি আরজ করলাম, 'তবে অর্ধেক'? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- তা তোমার ইচ্ছা। তবে এর চেয়ে বৃদ্ধি করলে তা তেমার জন্যই উত্তম হবে। অতঃপর আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে আমার দোয়ার সমস্ত সময়টা আমি আপনার প্রতি দুরূদ শরীফ প্রেরণে ব্যয় করবো? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন- তবে তোমার সকল দুশ্চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবে আর তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আওলাদে পাকও আছহাব গণের প্রতি খোদার রহমত নাযিল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করার নাম 'দুরূদ শরীফ'। পবিত্র কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সমূহে দুরূদ শরীফের বহু ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। দুরূদ শরীফ ইবাদতের একটি প্রধান অঙ্গ, দুরূদ যোগে ইবাদত না করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রত্যেক মোনাজাত ও দোয়ার পূর্বে দুরূদ শরীফ পড়া উচিত। হুজুরে পাক (সাঃ) এর শাফায়াত পেতে হলে সর্বদা দুরুদ শরীফ পড়া উচিত।

মিলাদ-কিয়াম শরীফ সম্পর্কে ঈমানদারগণের নিকট বলার বিশেষ প্রয়োজন রাখে না। এক কথায় আপদ-বিপদ, বালা-মছিবত, রোগ-শোক, মহামারী-বসন্ত, আসমানী ও জমিনী গজবের হাত হতে রক্ষা পেতে একমাত্র মিলাদ শরীফ পাঠ করে দোয়া করা অতীব ফজিলতের আমল। হাদীস শরীফে রয়েছে, যে স্থানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদ মাহফিল হয় সেখানে এক বৎসরের জন্য রহমত ও বরকত নাযিল হতে থাকে। হযরত উছমান গনি (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদ মাহফিলে খুশী হয়ে যদি কেউ এক দেরহাম খরচ করে সে যেন বদর ও হোনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সাওয়াব পাবে।

অতএব, ভাইগণ! জ্ঞান থাকতে কখনও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুরূদ মিলাদ কিয়াম শরীফ ছাড়বেন না। এখন আসুন আমরা ভক্তি ও প্রেমের সহিত নবীজির প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করি। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন। আমিন॥

অনুলিখন : মুফতি মুহাম্মদ এহছানুল হক জেহাদী আল মুজাদ্দেদী

নবীজীর সাথে বেয়াদবী করলে সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে

- মোহাম্মদ আবুল হাশেম

"মহান আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়" একথা যারা স্বীকার করে না তারা নাস্তিক। সারা বিশ্বের শত কোটি মানুষের খুব কম সংখ্যকই পাওয়া যাবে যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। বাকি সবাই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও সাইয়্যেদুল মুরসালিন আঁকা মাওলা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সুমহান পবিত্র রিসালতকে স্বীকার না করার কারণে তাদের অনেকে জান্নাত পাবে না। মুমিন হওয়ার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হল রাহমাতুল্লিল আলামিন রাউফ-উর-রাহিম সাইয়্যেদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন হাবিবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর রিসালতকে বিশ্বাস করা। কোরআন সুন্নাহ্ মোতাবেক রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে ভালবাসলেই রিসালাতে বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। সাহাবায়ে কিরামগণের রিসালাতে বিশ্বাস ছিল চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, কথা ও কাজে। সর্বোপরি জীবনের সর্বাবস্থায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সুউচ্চ শান ও আদব রক্ষা করা।

মক্কার কুরাইশগণ উরওয়াহ ইবনে মাসুদকে (তিনি তখনো ঈমান আনেন নি) পাঠিয়েছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জানার জন্য। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে সে কুরাইশদের বলল 'হে আমার গোত্র! খোদার কসম! কায়সার, কিসরা, নাজ্জাসী ও অনেক রাজা- মহারাজার দরবারে আমি গিয়েছি কিন্তু বাদশাহকে তার সহচরগণ এরূপ সম্মান করতে দেখিনি কখনো- যে রূপ সম্মান করে মুহাম্মদের সহচরগণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। খোদার কসম তিনি যখন থুথু নিক্ষেপ করেন, তা তাঁর সহচরদের কারো না কারোর হাতের উপর পড়ে, যা সে নিজ মুখমন্ডল ও শরীরে মালিশ করে। যখন তিনি তাদেরকে কোন আদেশ করেন তখন তা পালনের জন্য সবাই দৌড়ে যায়। যখন তিনি ওযু করেন তখন তার ওযুর পানি পাওয়ার জন্য তারা এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ে -যেন এখনই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আর যখন তিনি কথা বলেন, তখন সবাই নিরব হয়ে যায়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কেউ তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় না। তিনি তোমাদের নিকট হিদায়েতের বিষয় পেশ করেছেন -সুতরাং আমার পরামর্শ হল- তোমরা তা কবুল করে নাও। (বুখারী শরীফ)

হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেস্তে অবস্থানকালে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জামাল সৌন্দর্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস্ সালামের উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে সে নূরানী জামালকে প্রকাশ করলেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তা দেখে সসম্মানে চুম্বন করেন। এ ঘটনা পরবর্তীকালে জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যারা আজানের সময় আমার নাম স্মরণ করে দুহা'তের বৃদ্ধাগুলীর নখকে চুম্বন করতঃ চোখে মাছেহ করবে তারা কখনো অন্ধ হবে না। (তাফ্রিহুল আজকিয়া)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও রাসূলের অগ্রগামী হইও না; আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা হুজরাত; আয়াত-১)

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর পেয়ারা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা-বার্তায়, চলা-ফেরায়, আচার-আচরণে মোট কথা কোন বিষয়ে কখোনই অগ্রগামী হওয়া চলবে না। হযরত কাইস বিন শাম্মাস (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবী কানে কম শুনতেন বিধায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কথা-বার্তা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর বড় হয়ে যেত। আল্লাহ্ তায়ালা সহ্য করতে না পেরে এর নিন্দা করে আয়াত নাযিল করেন।

আল্লাহ জাল্লাহ শানহু আরো ঘোষণা দেন- "হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীজীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উঁচু করিও না, তোমরা একে অপরের সাথে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল নবীর সাথে সেভাবে কথা বলবে না। কারণ, এর ফলে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে অথচ তোমরা তা উপলব্দিও করতে পারবে না।" (সূরা হুজরাত; আয়াত-২)

"যারা আল্লাহর রাসূলের দরবারে নিম্নস্বরে কথা বলে আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।" (সূরা হুজরাত; আয়াত -৩)

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাসূলের প্রতি আদব শিক্ষা দিয়েছেন। কাজেই আদব এবং প্রেম ছাড়া রাসূল-এর শাফায়াত পাওয়ার কোন আশাই করা যায় না।

ওলিদ বিন মুগীরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল বলে অপবাদ দিয়েছিল। এতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠল -তাই তিনি সুরা 'কলম'-এর প্রথম ভাগে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযীলত ও গুণাবলী বর্ণনা করে তাঁর চিত্তকে প্রশান্ত করেন।

"আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি পাগল নন, আপনার জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার এবং আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। সুতরাং শত্রুর নিন্দা ও অপবাদকে উপেক্ষা করুন, আমি আপনার যে সব প্রশংসা করেছি এর প্রতি লক্ষ্য করুন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ওয়ালিদ বিন মুগীরার বেয়াদবী ও গোসতাখীর কারণে দশটি গালি দিয়েছেন।"

(হে রাসূল) "আপনি তার কথার প্রতি কর্ণপাত করবেন না, সে মিথ্যা শপথকারী, ঘৃণিত, অপমানিত, নিন্দাকারী, চোগলখোর, সৎকাজ নিষেধকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, পাষাণ হৃদয় এবং অধিকন্তু সে জারজ সন্তান।" (সুরা কলম; আয়াত-১০-১২)

উপরোক্ত আয়াত শুনবার পর ওয়ালীদ তার মার নিকট হাজির হয়ে বলল, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দশটি দোষ বর্ণনা করেছেন। তম্মধ্যে নয়টি দোষে আমি অবশ্যই দোষী। কিন্তু দশম দোষটির সত্যতা সর্ম্পকে তুমি আমায় জানাবে- আমি কি জারজ সন্তান, না বৈধ সন্তান? সত্য বলবে না হয় তলোয়ার দ্বারা তোমার শিরোচ্ছেদ করে দেব।" তদুত্তরে তার মা বলল, "বাস্তবিকই তুমি আমার জারজ সন্তান। তোমার পিতা ছিল পুরুষত্বহীন। এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। আমি আশংকা করেছিলাম যে, আমাদের কোন সন্তানাদি না হলে ধন-সম্পদ হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এই ভেবে আমি এক রাখালের সাথে জিনা (ব্যভিচার) করেছিলাম, তুমি তার বীর্য দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছ।"

উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা এটাই প্রতিয়মান হয় যে, হুজুর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে হেয় প্রতিপন্ন করার ধৃষ্টতা দেখায় তার আসলেই গলদ রয়েছে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিন্দাকারীদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ যে তাদের জন্ম বৈধ কি অবৈধ। সুতরাং সাবধান! দয়াল নবীজীর প্রতি সামান্যতম বেয়াদবীও আল্লাহ তায়ালা সহ্য করেন না। নবীজীর আদবই প্রকৃত ঈমান।

"সত্যিকার নবী প্রেমিকের আত্মা সহস্র কা'বার চেয়েও উত্তম।" কারণ, ক্বা'বা ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের নির্মাণ-আর সত্যিকারের আশেকে রাসূলের অন্তর আল্লাহর তাজাল্লিগাহ্। এ জন্য এই কাবা গাউসে পাকের তাওয়াফ করতে এসেছিলেন বলে আ'লা হযরত উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর লোকেরা ক্বা'বার তাওয়াফ করেন, আর ক্বা'বা আপনার তাওয়াফ করেন। ক্বা'বা ঘরের নির্মাতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম, নির্মাণ শেষে তা কবুল করার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান। তাও প্রিয় নবীর আগমনের ওছিলা দ্বারা। কারণ, এ ক্বা'বার মর্যাদা বিধান করবেন আখেরী নবী -এটাই কুদরতের পরিকল্পিত ব্যবস্থা। আর মুমিনের আত্মা বা ক্বালব্ স্বয়ং কুদরতেরই সরাসরী নির্দেশনা।

মূলতঃ হুজুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমিকদের কোন ভয় নেই। নবীজীর নূর নিয়ে অর্থাৎ নবী প্রেমিক হয়ে কবরে যেতে পারলে তাঁদের ভয় থাকার কথা নয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট আমরা এই কামনাই করি যে, হে আল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে নবী প্রেমিক হিসেবে কবুল করুন। আমিন!

ওহাবীদের প্রতি নসীহত : প্রথম খণ্ড

(ওহাবীদের গোমরাহী ও আহলে সুন্নতের উলামা কর্তৃক তার খণ্ডন)

মূল : আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক (তুরস্ক)

অনুবাদ : কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আল্লাহ তায়ালার নামের যিকরই কোনো ব্যক্তিকে তাসাউফের পথে উন্নতি করার জন্যে সাহায্য করে অত্যধিক। যিকরও শরীয়াতে আদিষ্ট একটি এবাদত। আয়াতসমূহ ও হাদীসে এটা পালনের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং এর প্রশংসাও করা হয়েছে। তাসাউফের পথে উন্নতির জন্য শরীয়তের নিষেধসমূহ এড়িয়ে চলা অপরিহার্য। ফরয পালন করলে এ পথে উন্নতি করা যায়। তাসাউফে জ্ঞানী মুরশিদ যিনি সালেক (পথচারী)-কে পথপ্রদর্শনে সক্ষম, তাঁর খোঁজ করার জন্যেও মানুষকে শরীয়তে আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা মায়েদার ৩৮ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ওয়াসিলা তালাশ কর। শরীয়তের বাহ্যিক বা প্রকাশ্য এবং প্রকৃত মর্মার্থ উভয়ই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অত্যাবশ্যক। কারণ বেলায়াতের সকল পূর্ণতা (মাহাত্ম্য, গুণাবলী) শরীয়তের বাহ্যিক অংশকে মান্য করেই অর্জন করা যায়। আর নবুয়তের গুণাবলী হচ্ছে শরীয়তের বাস্তবতা থেকে সৃষ্ট ফলসমূহ।

বেলায়াতের দিকে অগ্রসরমান হচ্ছে তাসাউফ। তাসাউফের পথে উন্নতি করতে হলে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব জিনিসের ভালবাসা হৃদয় থেকে বিদুরিত করতে হবে। যদি আল্লাহর রহমতে হৃদয় (কলব) সকল বস্তুর ভালবাসা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তবে ফানা-এর উদ্ভব হয় এবং সায়ের-এ ইলাল্লাহ্ পূর্ণ হয়। এর পর আরম্ভ হয় সায়ের-এ-বিল্লা-র যাত্রা, যার শেষ প্রান্তে রয়েছে কাংক্ষিত বাকা-র মর্যাদা। ফলে শরীয়তের বাস্তব দিকটি অর্জিত হল। যে মহান ব্যক্তিটি এই মর্যাদা লাভে সমর্থ হবেন, তাকে বলা হয় ওলী। এ পর্যায়ে নফস-এ আম্মারা মুতমাইন্নাতে পরিণত হয়। নফস তখন কুফর (অবিশ্বাস) পরিত্যাগ করে কাযা ও কদরে (নিয়তি) আত্মসমর্পণ করে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে চলে। নিজেকে নিজে বুঝতে আরম্ভ করে। অহম ও ঐদ্ধত্যের ব্যাধি থেকে এটা তখন মুক্তি পায়। তাসাউফের অধিকাংশ গুরুজন বলেছেন যে প্রশান্ত হওয়ার পরও নফস আল্লাহকে অমান্য করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। একটি গযওয়া (জিহাদ) থেকে ফিরে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আমরা ছোট জিহাদ থেকে ফিরলাম, এখন বড় জিহাদ আরম্ভ করবো। এই জিহাদ-এ আকবরকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নফসের সঙ্গে জিহাদ হিসাবে। এই ফকীর (ইমাম-এ রব্বানী), কিন্তু ওই অর্থে ব্যাপারটিকে গ্রহণ করি না। আমি বলি নফস প্রশান্ত হওয়ার পর তার মধ্যে আর কোনো অমান্য করার প্রবণতা অথবা খারাপ কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকেনা। অন্তরের মত নফসও সবকিছু ভুলে গিয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু দেখে না সম্মুখে। উচ্চ পদমর্যাদা ও ধনসম্পত্তির মিষ্টি এবং তিক্ত উভয় স্বাদের প্রতিটি নফসের নির্লিপ্ততা তখন প্রকাশ পায়। এটা তখন দমিত এবং অনেকটা অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর জন্যে এটা নিজেকে কোরবানী করেছে। হাদীসটিতে উল্লেখিত জিহাদটি সম্ভবত দেহের মধ্যে গঠিত উপাদানসমূহের পদার্থ, রাসায়নিক ও জৈবিক কামনাসমূহের জিহাদকে বুঝিয়েছে। শাহাদাত অর্থাৎ কাম, গ্বাযাব অর্থাৎ ভয় ও সন্দেহ উভয়ই বস্তুগত কামনা। জন্তু জানোয়ারের নফস নেই, কিন্তু এই সকল ক্ষতিকর ইচ্ছা তাদের মধ্যেই বিরাজমান। দেহের মধ্যে এক ধরনের উপাদান থাকার ফলেই জন্তু, জানোয়ারের কাম ক্রোধ ও সহজাত প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে। মানুষদেরকে এ সকল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। নফসের প্রশান্তি মানবকে এগুলো থেকে রক্ষা করে না। এগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ অত্যন্ত উপকারী। এটা দেহকে পবিত্র হতে সহায়তা করে।

ব্যক্তির নফস যখন দমিত হয়ে যায় তখনই তাঁর ভাগ্যে আল ইসলাম আল হাক্কিক্কি এসে যুক্ত হয়। তখনই প্রকৃত ঈমান অর্জিত হয়। এ সময়ে যে কোনো ধরনের এবাদত পালনই প্রকৃত হবে, সালাত, রোযা এবং হজ্জ সবগুলোই এদের প্রকৃত মূল্যে পাওয়া যাবে।

অতএব এটা পরিস্ফুট যে তাসাউফ হাকিকত হচ্ছে শরীয়তের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অংশের মধ্যে সংযোজক পথ বিশেষ। যে ব্যক্তি বেলায়তে খাসসা অর্জন করতে পারেনি, সে একজন মাজাযী তথা রূপক অর্থে মুসলমান হওয়া থেকে নিস্তার পায়নি, অর্থাৎ সে প্রকৃত ইসলাম অর্জন করতে পারেনি।

যে ব্যক্তি শরীয়তের বাস্তব দিকটি অর্জন করতে পেরেছেন এবং যাঁকে প্রকৃত ইসলাম অর্জনের সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, তিনি নবুয়তের গুণাবলীর অংশীদারীত্ব লাভ করতে শুরু করেন। হাদীসে ঘোষিত 'ওলামা-এ- কেরাম নবীগণের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী' শুভ সংবাদের বিষয়বস্তুতে পরিণত হন তিনি। শরীয়তের বাহ্যিক অংশের ফল যেমন বেলায়াতের গুণাবলী (পূর্ণাঙ্গতা), ঠিক তেমনি শরীয়তের বাস্তবতার ফল হচ্ছে নবুয়তের গুণাবলী। উইলায়াতের গুণাবলী হচ্ছে নবুয়তের গুণাবলীর বাহ্যিক রূপ।

শরীয়তের বাহ্যিক ও শরীয়তের বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যের উৎস হচ্ছে নফস। আর উইলায়াত ও নবুয়তের গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্যের উৎস দেহের উপাদানসমূহ। উইলায়াতের গুণাবলীর স্তরে উপাদানগুলো পদার্থ, রাসায়নিক ও জৈবিক অংশকে মান্য করে, অতিরিক্ত শক্তি আধিক্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং উপাদানগুলো খাদ্যের জন্য কামনা করতে থাকে। এ সকল প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে হায়া শরমহীন উদ্ভট কাজ কারবার সংঘঠিত হয়। নবুয়তের গুণাবলীর মধ্যে এ সব উদ্ভট কাজের অবসান ঘটে। আমার শয়তান মুসলমান হয়েছে হাদীসটিতে সম্ভবত এ সচেতনতার অবস্থাটি প্রতিভাত হয়েছে। কারণ মানুষের বাইরে অবস্থিত একজন শয়তানের মত ভেতরেও একজন শয়তান অবস্থান করছে। অধিক শক্তি মানুষকে বিচ্যুত করে এবং দাম্ভিক বানিয়ে দেয়, আর এটা বদ অভ্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপটা। এসব খারাপ দিক বর্জন করে নফস মুসলমান হয়ে যায়। নবুয়তের গুণাবলীতে অন্তর (ক্বলব) এবং নফস উভয়ই ঈমানদার হয় এবং দেহের মধ্যে মূলবিহীন উপাদানসমূহেরও মার্জিত আচরণ পরিলক্ষিত হয়। দেহের মধ্যে বস্তু ও শক্তির সামঞ্জস্য বিধানের পরই নফস দমিত হয়ে যায়। প্রশান্ত হওয়ার পর, এটা ক্ষতিকর হতে পারে না। এসকল শ্রেষ্ঠ গুণ শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটা গাছ যত শাখা-প্রশাখাই বিস্তার করুক না কেন এবং যত সুস্বাদু ফলই তৈরী করুক না কেন, সেটা মূলবিহীন হতে পারে না। প্রত্যেক গুণের জন্যে শরীয়তে অত্যাবশ্যক। (মকতুবাত: দ্বিতীয় খন্ড : পঞ্চাশ নং চিঠি)। অতএব এ কথা পরিস্কুট যে, "ওহাবীরা তাসাউফ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ হয়েই ওলীগণের কুৎসা রচনা করে বেড়ায় এবং তাঁদেরকে শরীয়ত বহির্ভূত আখ্যায়িত করে থাকে।"

২। ওহাবী পুস্তকটির ৪৮ এবং ৩৪নং পৃষ্ঠার লেখা রয়েছে, এবাদত তথা আমল মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এবাদত করে না এমন ব্যক্তির ঈমান দূর হয়। ঈমান বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পেতে পারে। আশ শাফেঈ, আহমদ হাম্বল এবং অন্যান্যরা সর্বসম্মতভাবে তাই বলেছেন। (ফাতহুল মজিদ)।

এবাদত যে একটি কর্তব্য তা বিশ্বাস করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিশ্বাস ও কর্তব্য পালন দুইটি ভিন্ন সংজ্ঞা, যেগুলোকে তালগোল পাকিয়ে ফেলা মোটেই উচিৎ নয়। কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে যদি আলস্যবশত তার বিশ্বাসকে আমল না করে, তবে সে কাফেরে পরিণত হবে না। ওহাবীরা এ ব্যাপারটি বুঝাতে না পেরে লক্ষ কোটি মানুষকে কাফের ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে। অথচ কেউ যদি কোনো প্রকৃত মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেয়, তা হলে নিজেই কাফেরে পরিণত হয়।

কাসিদা-এ আমলী গ্রন্থের তেতাল্লিশতম পংক্তিটি বলে, ফরজ এবাদত (মূল) ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ:) ঘোষণা করেন যে, আমল ঈমানের অংশ নয়। ঈমান অর্থ বিশ্বাস। বিশ্বাসের মধ্যে আধিক্য অথবা স্বল্পতা নেই। যদি আযাব দেখে ঈমান আনা হয়, তবে তা গ্রহণীয় হবে না; কিন্তু মৃত্যুকালে যদি কেউ ঈমান আনে তবে সেটা হবে হৃদয়ের বিশ্বাস, .এবাদত তার পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। আর এটাই হলো আয়াতে উল্লেখিত ঈমান। বহু আয়াতে ঈমানদারকে এবাদত করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, ঈমান আমল থেকে পৃথক। উপরন্তু কুরআনের আয়াত- 'যারা বিশ্বাস করে এবং যারা সওয়াবদায়ক কাজ করে' (পরিস্কুট করে যে ঈমান ও এবাদত এক নয়। 'ঈমানদার যারা সাওয়াবের কাজ করে'- আয়াতটি স্পষ্টই প্রতীয়মান করে যে, আমল ঈমান থেকে ভিন্ন। কারণ চুক্তি এবং যাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তারা এক হতে পারে না। একথা সর্বসম্মতিক্রমে জ্ঞাত হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনে এবং আমল করার সময় না পায়, তবে

তাকে ঈমাদনার হিসাবে ধরা হবে। হাদীস আল জিবরীল-এ ঘোষিত হয়েছে যে, ঈমান অর্থ বিশ্বাস।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী ও হাদীসের বহু ওলামা এবং আশআরী ও মুতাযিলা সম্প্রদায় বলেছেন যে, এবাদত ঈমানের অংগীভূত এবং এটা হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আরও বলেছেন যে, ঈমান ও এবাদত যদি ভিন্ন হতো তবে নবীগণের ও ফাসিক্কদের (পাপীদের) ঈমানও একই (পর্যায়ের) হতো। তাঁরা বলেন যে, 'আমার আয়াতগুলো শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়'। এ আয়াতটি এবং ঈমান বৃদ্ধি পেলে এর অধিকারীকে বেহেশতে নিয়ে যায় আর হ্রাস পেলে দোযখে' হাদিসটি ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধিকে বোঝায়। এর বহুকাল পূর্বেই ইমাম আবু হানিফা ব্যাপারাটির প্রত্যুত্তর দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ঈমানের বৃদ্ধি মানে স্থায়িত্ব, দীর্ঘায়ু। ইমাম মালেকও একই কথা বলেছেন। ঈমানের প্রাচুর্যের মানে হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়গুলোর বৃদ্ধি। উদাহারণস্বরূপ সাহাবা-এ কেরাম প্রাথমিক অবস্থায় অল্প কিছু বিষয়ে বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু নতুন নতুন আদেশের অবতরণের সাথে সাথে তাঁদের ঈমানও বৃদ্ধি পায়। ক্বলবে নূরের বৃদ্ধি হওয়াটাই হচ্ছে ঈমানের বৃদ্ধি। এ আলোকচ্ছটা এবাদত করলে বৃদ্ধি পায় আর গুনাহ করলে হ্রাস পায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে শরহে মাওয়াক্কিফ এবং জওহারতুত তওহীদ কিতাবগুলোতে। ওলামা-এ ইসলাম এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করে ওহাবী গোমরাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।

ওহাবী পুস্তকটির ৯১ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, একজন সাহাবা মদ্যপান বর্জন করেননি। তাঁকে শাস্তি স্বরূপ বেত্রাঘাত করা হয়। যখন কিছু সংখ্যক সাহাবা তাঁকে লা'নত দেন তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তাকে লা'নত দেবে না। কারণ সে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসে।

সহিহ বুখারী শরীফ কিতাবুল হুদুদ অধ্যায়, উমর ইবনে খাত্তাব হতে বর্ণিত। ফাতহুল মজিদ

ওহাবীটিও স্বীকার করেছে যে, ফাসিক্ব মুসলমান ফিসকের (পাপ) জন্যে কাফের (অবিশ্বাসী) হয় না। এ হাদীস ওহাবীদের দাবীকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। এটা আরও প্রমাণ করে, 'যে ব্যক্তি যেনা করে না, সে চুরিও করে না' -হাদীসটা ঈমানকে নয় বরং তার পরিপক্কতাকে ইশারা করে।

আল্লামা বিরগিওয়ীর লেখনী ব্যাখ্যাকালে হযরত আবদুল গনি আন্ নাবালুসী তাঁর প্রণীত আল হাদিক্বা গ্রন্থের ২৮১নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উম্মোচিত আল্লাহ পাকের জ্ঞানের ওপর হৃদয় দ্বারা বিশ্বাস এবং জিহবা দ্বারা তা ঘোষণা করাই হচ্ছে ঈমান। এ জ্ঞানের প্রত্যেক অংশ অধ্যয়ন করা এবং উপলব্ধি করা আবশ্যক নয়। মুতাযিলা গোমরাহ্রা বলেছিল যে, বিশ্বাস করার পর উপলব্ধি করতে হবে। হযরত আয়নী সহিহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকালে (শরহ) বলেন যে, মুহাক্কিক্কিন তথা উলামা-এ হক্কানী, যেমন, আবুল হাসান আল আশ্আরী, কাযী আবদুল জব্বার, আবুল এসহাক্ব আল ইসফাহানী, হুসেইন ইবনে ফযল প্রমুখ বলেছেন, ঈমান হচ্ছে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষিত বিষয়গুলোর ওপর অন্তরের বিশ্বাস। জিহবা দ্বারা ঘোষণা করা অথবা এবাদত করা ঈমান নয়। হযরত সাদ-উদ দ্বীন তফতাযানীও তাঁর শরহে আক্বাইদ গ্রন্থে এটা লিখেছেন এবং রওয়ায়াত করেছেন যে শামস্ আল আয়েম্মা ও ফখরুল ইসলামের মত ওলামা এটাকে জিহ্বা দ্বারা ঘোষণা করা অপরিহার্য বলেছেন। অন্তরের ঈমানকে জিহ্বা দিয়ে সমর্থন করার কারণ হল এতে মুসলমানগণ একে অপরকে চিনতে পারেন সহজেই। যে মুসলমান বলেন না যে তিনি মুসলমান, তিনিও মুসলমান। অধিকাংশ ওলামা যেমন, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন যে, আমল (মূল) ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও ইমাম আলী (রা:) ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যে ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন এবং তা জিহ্বা দ্বারা ঘোষণা ও এবাদত পালন, তবুও বস্তুত: তাঁরা বুঝিয়েছেন ঈমানের পরিপক্কতা বা পূর্ণ তাকে। এ কথা সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার হৃদয়ে ঈমানের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে তবে সে মুমিন (বিশ্বাসী) কোনো আলেমই তাকে বিশ্বাসী না আখ্যয়িত করে থাকেন নি। সহিহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় হযরত আল কারমানী লিখেছেন, যদি এবাদতকে (মূল) ঈমানের অন্তর্ভূক্ত

বিবেচনা করা হতো, তবে ঈমান বৃদ্ধি অথবা,হ্রাস পেত, কিন্তু অন্তরের ঈমান হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় না। যে বিশ্বাস হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়, সেটা কোনো ঈমানই নয়, বরং সন্দেহ ও অনাস্থা। ইমাম নব্বী বলেন, 'বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়গুলোর কারণসমূহ অধ্যয়ন এবং উপলব্ধি (বোঝা) করাই হচ্ছে ঈমান। হযরত আবু বকর (রা:)-এর ঈমান অন্য লোকদের ঈমানের মত নয়।' এই বাক্যটি ঈমানের দৃঢ়তা অথবা দূর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে। এর মানে এই নয় যে, ঈমান বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। এটা অনেকটা একজন অসুস্থ লোকের সঙ্গে স্বাস্থ্যবান লোকের তুলনা দেয়ার মতই ব্যাপার; তারা একই রকম শক্তিধর নয় কিন্তু উভয়ই মানুষ এবং তাদের মানুষ হওয়ার গুণের মধ্যে কোনো হ্রাস বা বৃদ্ধি নেই। হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ:) ঈমানের গুণ বর্ণনাকারী আয়াত ও হাদীসগুলোকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন সাহাবা-একেরাম ইসলাম গ্রহণের সময় সকল বিষয় বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। সময়ের বিবর্তনে পরবর্তী কালে আরও বহু বিষয় ফরয হয়ে যায়। তাঁরা এক এক করে সবগুলোকেই বিশ্বাস করে নেন। ফলে তাঁদের ঈমান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। এটা শুধু সাহাবা-এ কেরামের জন্যেই খাস (নির্দিষ্ট)। পরবর্তীকালে আগত মুসলমানদের জন্যে ঈমানের বৃদ্ধির চিন্তাই করা যায় না। শরহে আক্কাইদ গ্রন্থে হযরত সাদ-উদ-দ্বীন তাফতাযানী লিখেছেন : যারা অল্প জানে তাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনতে হবে, আর যারা বিস্তারিত জানে তাদের জন্যে সেই অনুসারে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। পূর্ববর্তীদের চেয়ে পরবর্তীদের ঈমান অবশ্যই বেশি। কিন্তু পূর্ববর্তীদের ঈমানও সম্পূর্ণ। তাদের ঈমান ত্রুটিযুক্ত নয়। শরহে আক্কাইদ গ্রন্থের উদ্ধৃতি শেষ হলো। (আলহাদিকা : ২৮১ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ)

হযরত আবদুল গণী নাবলুসী এর পর সিদ্ধান্ত টানেন : সংক্ষেপে, ঈমান নিজে নয়, বরং তার দৃঢ়তাই হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। অথবা যারা বলেছেন যে, এবাদত ও আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা আসলে ঈমানের পূর্ণতা বা মূল্যকে এর হ্রাস বৃদ্ধির মর্মার্থ স্বরূপ বুঝিয়েছেন। ঈমানের সিফাত বর্ণনাকারী আয়াত ও হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা তাই করা হয়েছে। যেহেতু এটা এ রকম একটা বিষয় যেখানে ইজতেহাদ প্রয়োগ করা যায়, সেহেতু বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যার আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাকারীই অপর কাউকে দোষারোপ করেনি। অথচ ওহাবীরা ঘৃণ্য ঔদ্ধত্যে মত্ত হয়ে এবাদতে বিশ্বাসী কিন্তু আলস্যবশতঃ আমল করতে অক্ষম মুসলমানদের কাফের ও মুশরিক ফতোয়া দিচ্ছে। (নাউযুবিল্লাহ্)

হযরত হাদিমী তাঁর রচিত বারিকা গ্রন্থে লিখেন, এবাদত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত জালালুদ্দিন আদ দাওয়ানী বলেছেন, মুতাযিলারা এবাদতকে ঈমানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করত এবং বলত যে, যারা এবাদত করে না, তারা বেঈমান (কাফের, অবিশ্বাসী)। এবাদত ঈমানকে পরিপক্কতা ও সৌন্দর্য্য দান করে; সালাফ আস্ সালেহীন বলেছেন যে, এবাদতের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি অথবা পাপের (গুনাহ) মাধ্যমে ঈমান হ্রাস পায় না। কারণ ঈমান মানে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস এবং তাই এটার হ্রাস বৃদ্ধি নেই।

ক্বলবে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত কুফরের হ্রাস পাওয়া; সেটা একেবারেই অসম্ভব। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আশআরী বলেছেন যে ঈমান হ্রাস বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মাওয়াক্কিফ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তাঁরা এই মন্তব্য দ্বারা ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধিকে বুঝাননি, বরং ঈমানের শক্তি (দৃঢ়তা)-কে বুঝিয়েছেন। কারণ নবী (আ:)-এর ঈমান ও তাঁর উম্মতের ঈমান এক নয়। নিজ কানে শ্রবণের পর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির ঈমান, জ্ঞান ও যুক্তিসহকারে বিচার বিশ্লেষণকারী শ্রোতার ঈমান হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ:) তাঁর ক্বলবে ইতমিনান (প্রশান্তি) অথবা ইয়াক্কিন (দৃঢ় বিশ্বাস) অর্জন করতে চেয়েছিলেন। ইমাম আযম তাঁর ফিকাহ-এ আকবর কিতাবে লিখেছেন: বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বেহেশতবাসী (ফেরেশতা) এবং পৃথিবীবাসীদের (মানব ও জ্বিন) ঈমান হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় না; ইতমিনান কিংবা ইয়াক্কিনের ফলেই ঈমান বাড়ে বা কমে। আরেক কথায়, ঈমানের শক্তি হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়; তবে ইয়াক্কিনহীন (শক্তি বিহীন) ঈমান কোনো ঈমান নয় এবং ধারণা অথবা সন্দেহ। ফিকাহ-এ-আকবরের উদ্ধৃতি শেষ এখানে শেষ হলো। (হযরত হাদীমী বারিক্ব) *(চলবে)*

প্রচলিত তাবলীগ জামাত ও কিছু কথা

আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন আহমদ

বর্তমানে "তাবলীগ জামাত" নামে একটি ধর্ম প্রচারক দল মুসলমানদের মধ্যে কালেমার দাওয়াত দিচ্ছে। এ দলের মূলনীতি (উছূল) হলো ৬টি যথা- ১. কালেমা, ২. নামাজ, ৩. একরামূল মুসলেমীন, ৪. তাসহীহে নিয়্যত, ৫. ইলেম ও যিকির এবং ৬. নাফরুন ফী সাবীলিল্লাহ্ বা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। অতি সংঘবদ্ধভাবে এ দলটি এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে গিয়ে তাদের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আহার নিদ্রা সবকিছুই মসজিদে সামাধা করে থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে এ দলের সদস্যগণের যাবতদীয় ব্যয়ভার দলপতিই বহন করে থাকে। ১৩৪৫ হিজরিতে (১৯২৫ খৃষ্টাব্দে) প্রচলিত তাবলিগ জামাতের যাত্রা শুরু হয়। দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাছিম নানাতুবীর অনুসারী, দেওবন্দী আলিম আশরাফ আলী থানভীর বিশেষ ছাত্র মৌওভী ইলিয়াছ মেওয়াতী ১৯৩৮ সালের ১৪ মার্চ সউদী আরবের তৎকালীন বাদশাহর সাথে ৪/৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এই সাক্ষাৎ আলোচনার পর থেকে "তাবলীগ জামাতের" কর্মতৎপরতা ব্যাপকভাবে শুরু করেন। বতর্মান তাবলীগ জামাতের প্রধান প্রচার কেন্দ্র হচ্ছে ভারতের দিল্লীতে। তাদের কেন্দ্রটি হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলায়াহির মাযারের প্রধান গেউট সংলগ্ন তাবলীগী মসজিদ। দ্বিতীয় প্রচার কেন্দ্র পাকিস্তানে এবং তৃতীয় প্রচার কেন্দ্র হচ্ছে বাংলাদেশ (কাকরাইল মসজিদ)। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সৃষ্টি-জগতের আদি থেকে নবী রাসূলগণ এবং তারপর থেকে অধ্যাবধি খাঁটি আলেম ও আল্লাহর ওলীগণ তাবলীগ তথা ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্য চালিয়ে আসছেন। এ ওহাবী-তাবলীগীরা বুযর্গদের এ নিয়মটা অবলম্বন করেছে। ইসলামের সঠিক আদর্শ প্রচারের নির্দেশ দিয়ে- পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ এরশাদ ফরমান, "তোমাদের মধ্যে একদল লোক এমন হওয়া চাই, যারা মঙ্গলের প্রতি আহবান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দিবে অসৎ কাজের নিষেধ করবে। [সূলা আলে ইমরান, আয়াত- ১০৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে আছে "এ আয়াতের মধ্যে "মিন্" শব্দটি দ্বারা কিছু সংখ্যক লোককে বুঝায়। কেননা দ্বীনের প্রচার করা ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোকের উপর ফরজ। এ নির্দেশ সমস্ত উম্মতের প্রতি নয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এর যোগ্য নয়। যেমন- মূর্খ ব্যক্তি"। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, উপদেশ দানে (তোমরা) নম্রতা অবলম্বন কর, কঠোরতা অবলম্বন করো না, সুসংবাদ দাও, ঘৃণার উদ্রেক করো না"। এ থেকে বুঝা যায় যে, অমুসলিমদের মাঝে তাবলীগ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ বর্তমান যুগের প্রচলিত তাবলীগ পন্থীদের দেখা যায় যে, তারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রচার করে, তা হচ্ছে ওহাবী মতবাদ আর অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত সম্পূর্ণ পরিহার করে শুধু মুসলমানদেরকেই কালেমার দাওয়াত দিচ্ছে। কালোমার দাওয়াতও এ জন্য যে, তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে মুসলমান মনে করে না, যেমনটি ঐতিহাসিকভাবে বিকৃত খারেজীদেরই আক্বীদা বা বিশ্বাস। তাই তারা প্রথমে কালেমা পড়ায়। তাদের মধ্যে আরেকটি প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও সময় সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখেনা। এটাও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শিক্ষা ও আদর্শ বিরোধী। কারণ, বোখারী শরীফে আছে- খায়বার বিজয়ের প্রাক্কালে যখন শেষবারের মত হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামী পতাকা নিয়ে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রওনা করেছিলেন। তখন আলী বদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, হুযুর! ওখানে গিয়ে কি প্রথমেই যুদ্ধ আরম্ভ করে দেব? এবং ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব"? রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "না, তা নয়; বরং ওখানে পৌঁছে প্রথমে শান্তিভাবে তাদেরকে ইসলামে দাওয়াত দেবে। ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে, যদি তোমার চেষ্টায় একটি মাত্র ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা গণীমতের মূল্যবান লাল রঙ্গের উট হতেও শ্রেষ্ঠ মনে করবে। যদি তারা তা অমান্য করে তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে জিযিয়া কর দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। হতভাগারা যদি তাও অমান্য করে,

তবে অগত্যা যুদ্ধ করবে"। এ হাদীস থেকে একথাও বুঝা যায় যে, অমুসলিমদের সাথে জিহাদ করার পূর্বে তাদের ইসলামের ব্যাপক প্রসার লাভ সম্ভব হয়েছে কিন্তু বর্তমান যুগের তাবলীগীরা কোন অমুসলমানদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দেয়না, মুসলিমদের মধ্যে যারা ফাসিক্ ও দ্বীন-ধর্মের প্রতি বেপরোয়া তাদেরকেও তারা দাওয়াত দেয়না। বরং মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা আল্লাহ্র ভয়ে নামাযী হয়ে গেছে শুধুমাত্র তাদের কাছেই তাদের দাওয়াত পৌছিয়ে থাকে। এতে কি একথা বুঝা যায় না যে, তাদের উদ্দেশ্য ইসলামের দাওয়াত দেওয়া নয় বরং ওহাবী মতবাদ প্রচার করা, তাও সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে। এ কারণে এ পর্যন্ত দেখা গেছে, তারা এ তাবলীগের মাধ্যমে মানুষকে ওহাবীই বানিয়েছে, তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতাও একথা অকপটে স্বীকার করেছেন, তার তাবলীগের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মৌং আশরাফ আলীর শিক্ষাকেই তার প্রবর্তিত পদ্ধতিতে প্রচার করা। হযরত রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনেকবার সাহাবা-ই কেরামদেরকে অমুসলিম, বেদ্বীন ও কাফেরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেছেন। বর্তমানে প্রচলিত ওহাবীপন্থী তাবলীগীরা দাবী করে, সাহাবা-ই কেরামগণ মুসলমাদের নিকটেও তাবলীগ করেছেন। দূর দূরান্তের যে সকল রসূলে পাককে নবী বলে স্বীকার করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শিক্ষা পদ্ধতি ও ইসলামের নিয়ম-কানুন অবগত করানোর জন্যই তারা এ ব্যাবস্থা গ্রহণ করে আসছে। বাস্তবিক পক্ষে তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, সকল সাহাবী হেদায়তের কাজে প্রেরিত হতেন, তাঁরা ইল্মে তাসাওউফের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু বর্তমান যুগের ওহাবী তাবলীগপন্থীদের ইলমে তাসাওউফের জ্ঞান তো দূরের কথা, তাদের কতেক রীতি-নীতি ও ধারণা ইসলামে মৌলিক আক্বিদা ও রূপরেখার পরিপন্থী। তাছাড়া, যারা তাদের মুরব্বী বলে খ্যাত, তাদের বেশিরভাগই প্রকৃত পক্ষে ইসলামের রীতিনীতি, কোআন ও হাদীসের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রদত্ত নির্দেশ সম্পর্কে যথাযথভাবে ওয়াকিফহাল নয়। ফলে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন। কী করে তারা অন্যের কাছে ইসলামর দাওয়াত পৌছবে? হযরত রসূল করীম'র যামানায় যে সকল সাহাবা-ই কেরাম অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতেন, তাঁরা ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধীকারী; দ্বীনের এক একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। হযরত ওসমান গনী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শেষ যামানায় আহমক ও অপরিণামদর্শী একটি দল বের হবে, যারা খুব ভাল ভাল কথা বলবে কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে থাকবেনা। তীর যেভাবে ধনুক থেকে বের হয়ে (দ্রুত ছুটে) যায় তারাও দ্বীন হতে সেরূপই বের হয়ে যাচ্ছে"। [বুখারী শরীফ] বর্তমান যুগের প্রচলিত তাবলীগ পন্থীদের বেলায় এ হাদীসটি প্রযোজ্য। কেননা, যেখানে হযরত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের ৫টি মূলনীতির কথা ঘোষণা করেছেন এবং স্বয়ং সহাবা-ই কেরাম অমুসলিমদের মাঝে ওইগুলোর মাধ্যমেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, পক্ষান্তরে প্রচলিত তাবলীগীরা তাদের ৬ উছুলের (মূলনীতি) তাবলীগ করছে। আর তা মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। সুতরাং এটা যে একটা ভ্রান্ত মতবাদ তা বলা যায় নিঃসন্দেহে। উল্লেখ্য বর্তমানের প্রচলিত তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাকারী মৌং ইলিয়াছ ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক শহরে অবস্থিত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় লেখপাড়া করেছেন। এ মাদরাসার ৮৫ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার আলিয়া মাদরাসাটি। ওহাবী মতবাদের প্রচারকেন্দ্র বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী কওমী মাদরাসাগুলো এই বাতিল ওহাবী মতবাদ প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পক্ষান্তরে তাবলীগপন্থিরা বিশ্বাস করে নবী আলাইহিমুস্ সালাম দ্বারা আল্লাহ যে কাজ সমাধা করেন নাই, তাবলীগীদের দ্বারা তাদাপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে পারে। (না'উযু বিল্লাহ্) [মাকাতিবে ইলিয়াছ পৃষ্ঠা- ১০৭)

বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ জামাত এর স্বরূপ জানতে হলে নিম্নোক্ত বইগুলো পাঠ করা দরকার- ১. তাবলীগী জামাত, কৃত- আল্লামা আরশাদ আলকাদেরী। ২. তাবলীগ দর্পণ, কৃত হাফেজ মঈনুল ইসলাম। ইত্যাদি। কাজেই ঈমান আক্বিদার সংরক্ষণে এ ফেরকার ব্যাপারে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সচেতন থাকা উচিত।

সুন্দরের পরশমণি
হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (রহঃ)
আ.শ.ম. বাবর আলী

সৌম্যকান্তির এক সাধক দরবেশ হাজির হলেন মুন্শী মোহাম্মদ দানেশের রোগশয্যার পাশে। পরম পবিত্রতায় স্পর্শ করলেন তাঁকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দোওয়া করলেন। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন, 'এ বংশ আরো উজ্জ্বল হবে। একজন পরম বুজর্গ ব্যক্তির আগমন ঘটবে। তাঁর কল্যাণে আলোকিত হবে এই সংসার, সমাজ আর জাতি।

তারপর অপেক্ষার পালা। কবে বাস্তবায়িত হবে দরবেশের শুভ্র-সুন্দর-কল্যাণ-আনন্দ-আশীর্বাদ।

অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো। মুন্শী মোহাম্মদ দানেশের পুত্র মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীনের ঘর আলোকিত করে এলেন এক জ্যোতির্ময় শিশু। মা আমিনা খাতুন আর বাবা মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন অনেক আদর করে নাম রাখলেন 'আহছান'। অর্থাৎ সুন্দর। কী সেই সুন্দর? কার সুন্দর?

আল্লাহর। আল্লাহ যাঁকে বিশেষভাবে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর 'ছিফাত' দিয়ে। তাই তিনি সুন্দর। আহ্ছান। আল্লাহর গুণাবলীতে সুন্দর । আহ্ছানউল্লাহ।

পবিত্র আলয় থেকে ধুলি ধরনীতে এলেন তিনি। শতাব্দি আর দশকের হিসেবে ইংরেজী ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বরে।

এটুকুই প্রাপ্ত তথ্য তাঁর আগমনের। বাকিটুকু শ্রুত, অনুমান অথবা অসম্পূর্ণ তথ্যে। সে সূত্র মতে যেটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় তা হচ্ছে, ডিসেম্বরের কোনো এক শনিবার। আরও একটু অনির্ভর তার্কিক (কিন্তু উপেক্ষনীয় নয়) তথ্যে 'ডিসেম্বরের শেষ শনিবার'।

এ বিভ্রান্তির কারণ কি?

অন্তর্নিহিত কোনো ব্যাপার অথবা বিষয় কি আছে?

থাকতেও পারে।

আবার না-ও থাকতে পারে"।

এ সম্পর্কে নিজে খোলাসা করে কিছু না বললেও আমাদের বিস্ময় আর আগ্রহকে অপনোদনের জন্য আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি 'এভাবে-সম্ভবতঃ কোনো মোছলমান কোষ্ঠীপত্র রাখেন না, সেইজন্য বয়স সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নহি।' নিজেই যিনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত নন, সেখানে অনুমান অথবা অদালিলিক তথ্যের ওপর নির্ভর ছাড়া আমাদের আর উপায় কি?

তবে একটা হিসেবে ধরা যেতে পারতো। তা হলো, এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে উল্লেখিত জন্ম তারিখ, যা আমরা অনেকেই করে থাকি। কিন্তু ব্যাপার হলো, ওই তারিখটা সঠিক নাও হতে পারে । অর্থাৎ সেটাতেও সন্দেহের চারা থাকতে পারে। তাই তেমন বিভ্রান্তিমূলক অনিশ্চিত তথ্যে তিনি যেতে চাননি।

আর সেটাও বড় কথা নয়।

কথা হলো সেই প্রবাদ বাক্য-'জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো।'

এটকু প্রসঙ্গ পরিবর্তনে বলা যেতে পারে-'জন্ম হোক যখন তখন, কর্ম হোক ভালো।'

সেই ভালো কর্মের মানুষইতো হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (রঃ)।

কি সেই ভালো কর্ম?

কি ভালো কর্ম তাঁর ছিল না মানুষের জন্য? মানবতার জন্য? মানবতার মুক্তির জন্য। মানব জীবন ও মানবতাময় জীবন-দর্শনের জন্য। দেশ, সমাজ ও জাতির জন্য?

সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। তাঁর আগে দেখা যাক, তার জীবন-দর্শন।

সবার আগে তাঁর জীবন-দর্শন ছিল, তা হচ্ছে তাঁর আধ্যাত্ম-জীবন, যা তাঁকে পরিচালিত করেছে একজন আদর্শ-মহামানব হতে।

বস্তুতঃ পারিবারিকভাবে তিনি ছিলেন একটি ধর্মপ্রাণ পরিবারের সন্তান। পিতা মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন যশোর জেলার নওয়াপড়া পীরবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইরানী পীর মাওলানা মোহাম্মদ আলী শাহের ভক্ত। তাঁর কাছেই বায়াত হন মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, একটি সাবলীয় ধর্মীয় পরিবেশই তাঁর এ পবিত্রতম আধ্যাত্ম জীবন গঠনে সহায়ক হয়।

তা-ইবা বলি কি করে?

তাঁর পার্থিব জীবন প্রস্তুতির শুরু এবং চলয়মানতা যেভাবে ছিল, সেখানে তো এ হিসেব মেলে না। কোনো ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাতে তিনি তো লেখাপড়া

করেননি, কোনো মৌলভি-মাওলানার কাছেও নয়, তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় বাবু মতিলাল ভঞ্জচৌধুরী নামের এক হিন্দু পন্ডিতের কাছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর পরবর্তী শিক্ষার জন্য বশিরহাটের টাকি হাইস্কুলে ভর্তি হন বাবু অনঙ্গ মোহন বসুর তত্ত্বাবধানে। সেখানে থাকতেন জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের আশ্রয়ে। এমনিভাবে পড়াশুনার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অধ্যয়নকালে কখনো কোনো রকম স্বধর্ম পরিবেশ পাননি তিনি। কখনো হিন্দু কখনো খ্রিস্টান। সুদীর্ঘ চাকরি জীবনেও তাই।

কিন্তু এতে করে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবনে। সংঘাতও ঘটেনি আপন ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের অথবা ধর্মীয় মানুষের। বরং এমন পরিবেশে আরও মজবুত কাঠামোর ওপর অবস্থিতি ঘটিয়েছে তাঁর আধ্যাত্ম অবস্থানকে।

এটা কি কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হয়?

হয়তো তাই।

আমাদের অতি সাধারণ ও সীমিত চিন্তাধারায় তো সে রকমই ধারণা হয়।

কিন্তু আমাদের সসীম চিন্তাধারাকে প্রসারিত করলে এর অন্য যথার্থ বিশ্লেষণ পাবো আমরা।

তিনি তো আহ্ছানউল্লা। আল্লাহর সুন্দর। নিজেই যিনি আল্লাহর সৃষ্টি সুন্দর মানুষ, স্বাতন্ত্র্য সুন্দর থেকে আপনাকে সৌন্দর্য মন্ডিত হওয়ার তাঁর প্রয়োজন কোথায়? অন্য কিছু কেন তাঁর সৌন্দর্য্য বিকাশের প্রতিবন্ধক হবে? বরং বিপরীত পারিপার্শ্বিক অবস্থার আপন সৌন্দর্যকে স্ফূরণ ও প্রস্ফূটিত করাতেই তো তার যথার্থ পরিচয় ও কৃতিত্ব। এ কৃতিত্বের পূর্ণ অধিকারী তিনি। তাঁর গোটা জীবন। ধর্মীয় জীবনের সহায়তা নিয়েছেন তিনি স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকে। পাঠ নিয়েছেন স্রষ্টার অনুপম সৃষ্টি প্রভৃতি থেকে।। তাইতো সহস্র কর্মকাণ্ডময় জীবনের মাঝেও আধ্যাত্ম-পাঠ নিতে তিনি ছুটে গেছেন মনমুদ্ধকর প্রাকৃতিক পরমণ্ডলে। সেখানে শুচিশুভ্র ভাবনায় আত্মলীন হয়ে খুঁজে পেয়েছেন পরম সত্য আর সম্যময়কে। সত্যময়ের সন্ধান করেছেন বিভিন্ন গিরি-পর্বত আর অরণ্য আরণ্যকে। অসবর সময়ে কুতুবদিয়া, ছনুয়া, জুলদিয়া, ধোবছড়ি, বান্দরবান, দোহাজারী, টেকনাফ, ময়নামতি, বাড়বকুন্ড প্রভৃতি স্থানের মনোরম নির্জন প্রকৃতি হয়েছে তাঁর সাধনা ক্ষেত্র, আবাদ হয়েছে তাঁর মানষপটে শুচিতম সাধনার জীবন। আর সে বীজ অঙ্কুরোদগমিত ফসল ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন আজমীর শরীফ, দেওয়া শরীফসহ অসংখ্য পবিত্র মার্গের পরম শীর্ষে আরোহন করেছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন তাঁর কালের সবশ্রেষ্ঠ তো বটেই, উপমহাদেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক। সূফীবাদের মূল কথা যে, প্রেম, স্রষ্টার প্রতি প্রেম, সে প্রেমে তিনি যে কত উচ্চস্তর মাপে আরোহন করেছিলেন, তা ভাবতে ও সে ভাবনার সীমানায় উপনীত হওয়াও আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই সূফীসধানার মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে তাঁর এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তিনি বলতেন-'আশেকের সাথে মাশুকের বন্ধন সুদৃঢ় না হলে মাশুকের প্রাপ্তি ঘটে না।' সে বন্ধনে হযরত খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (রঃ) শীর্ষতর অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর মাশুক তাঁকে যে কোন আসনে সমাসীন করে নিয়েছিলেন, সে কথা তিনি ছাড়া আর কারো জানবার ব্যাপার নয়, শুধু অনুভবনীয়। তাঁর আরও অমৃত বচন-'আল্লাহ্, রাসুল আর আশেক এক বৃন্তের তিন ফুল, এর একজনকে বাদ দিলে বৃন্তের সৌন্দর্য হানি হয়।' এ সৌন্দর্য শোভা বর্ধনের কী অযুত শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন হযরত খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)। তাইতো তিনি পীর। আমাদের পীর। আশেক সন্ধানী মানুষের পীর।

এদেশের মুসলমান জাতির জন্য তিনি অনেক কিছুই করেছেন। বিশেষ করে এদেশের শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর প্রশাসনিক দায়িত্ব পেয়ে যে আনুকূল্য তিনি লাভ করেছিলেন, তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি। যে কোনো জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুশিক্ষা। এদেশের শৌর্যহারা, মুসলমানদের জন্য তা-ই তিনি করেছেন। করেছেন শিক্ষা পদ্ধতির নানাবিধ সংস্কার, বিভিন্ন এলাকায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ছাত্রাবাস প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা। এদেশের নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে তার অবদান সকৃতজ্ঞতায় স্মরণীয়। মুসলমান সমাজকে হাত ধরে টেনে তোলার জন্য এসব তিনি করেছিলেন ঠিকই; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। বরং তাঁর প্রতিষ্ঠিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যাই ছিল বেশি। প্রতিভা স্ফূরণের প্রতিবন্ধকতা কারো ক্ষেত্রেই ছিল না। সবারই ছিল সমসুযোগ সৌভাগ্য।

ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। এদেশের মুসলমানরা যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক স্বাধিকার বঞ্চিত হয়ে হতদরিদ্র জীবনকে অনুষঙ্গ করে অসম্মানিত আত্ম-অবস্থানের ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ হয়ে ছিল, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (রাঃ) আগমন সেই তমসাধন কালিকে।

ব্যথিত হলেন তিনি বিরাজমান এ পরিমন্ডল পরিদর্শনে। জাতীয় অকল্যাণকর উপলব্ধিতে।

অনেক পেছনে পড়ে আছে এদেশের মুসলিম সমাজ। অনুসন্ধান করলেন যে পশ্চাৎপদতার অনুসঙ্গ উপসর্গ। দেখলেন, শিক্ষার অগস্রতাই তন্মধ্যে বৃহত্তর। সমতায় অথবা ক্ষুদ্রতায় তার সাথে আরও কিছু তো আছেই। সংগৃহীত হলো তাঁর মনন সত্তায়, আত্তোপলব্ধিতে। মনন চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে নিপতিত সমাজকে উজ্জীবনের মন্ত্র নিলেন বক্ষে। শক্তিতে নয়, যোগ্যতায় স্বমহিমায় উর্ধ অবস্থানে থাকা অন্য ধর্মীদেরকে অবজ্ঞা অথবা অবহেলা করে নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা প্রতিযোগিতা করে নয়, তাদেরকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাদের আসন দখল করে নয়-যথার্থ যোগ্যতা অর্জন করে তাদের সমকক্ষতা লাভ করা। এক কথায় সংঘাত নয়, সমতা অর্জন। অন্যের যোগ্যতাকে অসম্মান করে নয়, আপন সিদ্ধিতে সমযোগ্যতায় উত্তরণ। এদেশের মুসলমান সমাজের প্রতি হযরত খানবাহাদুর আহছানউল্লাহর (রঃ) প্রাথমিক অথচ সমৃদ্ধ জীবন দর্শন ছিল এটাই। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য পদে অধিষ্ঠান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর সুদৃঢ় ভূমিকা আর এর প্রতিষ্ঠা কাল ১৯২১ সাল থেকে একটানা প্রায় দশ বছর কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য পদে সম্মানিত অবস্থানের উদ্দেশ্য ছিল তো এটাই। শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য অঙ্গনের মত তাঁর এবম্বিধ ভূমিকাতে সুবিধাভোগী তো এদেশের সর্বধর্ম, সর্ব গ্রোত্রীরাই হয়েছিল। মহৎপ্রাণ অসাম্প্রদায়িক মহাপুরুষের সংজ্ঞা আর কি হতে পারে? 'কোনো ধর্মকে অশ্রদ্ধা করিবে না'-এ শিক্ষা তো তিনিই দিয়ে গেছেন আমাদেরকে। তিনিইতো বলেছেন-'আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানি না। শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় প্রভেদ দেখি না, ছোট বড় বুঝি না, সবারই মধ্যে তাঁহার দান, তাহার নূর, তাঁহার এহ্ছান বর্তমান। আমি কাহাকে ক্ষুদ্র বলিবো, কাহাকে কাফের ডাকিবো, কাহাকে ঘৃণা করিব।' [আমার জীবন-ধারা: পৃষ্ঠা-১৪৭।]

ভাবতে অবাক লাগে, একজন মানুষের মধ্যে এত বেশী বিভিন্নমুখী গুণের সমাবেশ কেমন করে ঘটে। একক কোন দিকে প্রাজ্ঞ সাফল্য ছিল তাঁর? শুধু ধর্মীয় নয়, মানব জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনে আর যেসব পার্থিব অনুসঙ্গ প্রয়োজন, তার সর্বক্ষেত্রে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহর (রঃ) ছিল সমপারদর্শিতা। সাহিত্য জীবনের দর্পণ। সুষ্ঠু ও সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই এ অঙ্গনেও তিনি ছিলেন সফল সাধক। জীবনের বিভিন্ন দিক সুনিপুণ-দক্ষতায় সৃজিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তিনি ছিলেন দর্শন (Philosophy) শাস্ত্রের ছাত্র। কিন্তু সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি মননশীল শাখাতে ছিল তাঁর প্রাজ্ঞ বিচরণ। কোরআন, হাদীস, শিক্ষা ও আদর্শমূলক জীবনী, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ কাহিনী, সাহিত্য সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি প্রতিটি শাখাতে ছিল তাঁর সফল লেখনী পরিচালনা। এমনকি তাঁর লেখা 'টীচারস্ ম্যানুয়েল' গ্রন্থখানি তো সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পদ্ধতির দিক নির্দেশনা। ভাবতে অবাক লাগে বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও তাঁর সর্ব প্রথম লেখাটি কিন্তু একটি বিজ্ঞান গ্রন্থ। গ্রন্থটির নাম পদার্থ শিক্ষা। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে যখন তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার।

এত যে বিভিন্নমুখী গুণাবলী আর শ্রেয়তর প্রতিভা আমাদের মুর্শিদ মাওলানা হযরত খানবাহাদুর আহ্ছান্উল্লাহর (রঃ), কোনোটাই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয়। ইসলামী লাইনে পড়াশুনা না করেও জামানার শ্রেষ্ঠ আউলিয়া, আদর্শ মহাপুরুষ; সাহিত্যের পাঠশালায় না পড়েও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাহিত্য গবেষক, আন্দোলনে প্রশিক্ষিত না হয়েও অন্যতম উত্তম সমাজ সংস্কারক, শিক্ষায় বিশেষ প্রশিক্ষণ না নিয়েও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীধারী না হয়েও সকল মনোবিদ ও মনোচিকিৎসক এমনি আরও সব, যা সুন্দর, সুফল, কল্যাণময় মানব জীবন গঠনে অনিবার্য সহায়ক সব কিছুই।

সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য সব প্রশিক্ষণ হয়তো তিনি দেননি, কিন্তু প্রশিক্ষিত শুচিময় আদর্শ মানব তিনি যে ছিলেন-সেটা তো সুনিশ্চিত। আর তাঁর প্রশিক্ষক ছিলেন সকল প্রশিক্ষকের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণদাতা পরম করুণাময় আল্লাহ বারী তা'য়ালা। যে শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন সেই মহান পাক আল্লাহ থেকে, আপনার লব্ধ সেই প্রশিক্ষণই তিনি দিয়ে গেছেন, রেখে গেছেন, তার পথ নির্দেশনা তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ ভক্তকুলের আদর্শ জীবন গঠনের জন্য।

আর সেইজন্যই তো তিনি 'আহ্ছান'। 'সুন্দর'। আল্লাহর গুণাবলীতে সুন্দর। আহ্ছানউল্লা (রঃ)....! আমাদের মুর্শীদ। ওলীয়ে কামেল পীর কেবলা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)।

যৌতুক ও ইসলাম ঃ একটি পর্যালোচনা

সৈয়দা শারমীন আক্তার

যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক মারাত্মক অপরাধ। এটা মানবতা ও সমাজ বিরোধী কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, নীতি বিবর্জিত একটি সামাজিক সমস্যা ও মানব সমাজে অমানবিক প্রথা। এ প্রথা ইসলাম সমর্থন করে না। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দেলন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। যৌতুকের প্রতিশব্দ হলো পণ। এ শব্দ দুটি মূলত সংস্কৃত ভাষারই শব্দ। হিন্দি ভাষায় একে 'দিহাজ' ও ইংরেজীতে **Dowary.** বলে। উর্দূ ও আরবীতে একে 'জাহীয' বলা হয়। স্থান,কাল ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন দেশে বিয়ের ক্ষেত্রে কনের পক্ষ থেকে বর পক্ষকে অর্থ, সম্পত্তি, উপঢৌকন, উপহার সামগ্রী,অলংকার, আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ইত্যাদি মূল্যবান সামগ্রী দেয়াকে বর্তমান সমাজে যৌতুক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিষয়টি খোলাসা করে বলতে গেলে যৌতুক বলতে বুঝায় বিয়ে উপলক্ষে বর পক্ষ দর কষাকষির মাধ্যমে কনে পক্ষের অভিভাবকের নিকট থেকে অধিক পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ও দ্রব্যসামগ্রী আদায় করা।

কখন থেকে যৌতুক প্রথার প্রচলন হয়েছে তার দিন, কাল-সময় ও তারিখ নির্ধারণ করা না গেলেও জাহিলি যুগে যখন মেয়েদেরকে বোঝা মনে করা হতো তখন থেকেই এর একটা চাপা ধারনা সমাজে চলে আসছে। তবে মুসলিম সমাজে এর প্রচলন ছিল না। মূলতঃ হিন্দু সমাজেই এর প্রচলন শুরু হয়। হিন্দু সমাজে কনে পক্ষের অভিভাবক বর পক্ষের অভিাভাবককে যৌতুক দেয়। কারণ, মেয়েরা পিতার সম্পত্তির কোন অংশীদার হয়না। ফলে বর পক্ষ বিয়ের সময় যৌতুকের মাধ্যমে যা প্রয়োজন তা আদায় করে নেয়।

বর্তমান সমাজে প্রচলিত যৌতুক প্রথা ইসলাম সমর্থন করে না, কারণ, যৌতুক সমাজের একটি বোঝাস্বরূপ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ঐ বিয়ে সর্বাধিক বরকতময় যে বিয়ে বোঝার দিক দিয়ে অধিক হালকা হয়" (বায়হাকী, ঈমান অধ্যায়)। ইসলামে যৌতুক নিষিদ্ধ হলেও বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে যৌতুকের লেন-দেন একটা সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এমনকি যৌতুকের কারণে আমাদের বাংলাদেশের বহু নারী বিয়ের পর বিবাহচ্ছেদের শিকার হয়। তবে যৌতুক ও উপহারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উপহার নিষিদ্ধ নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, এতে তোমাদের মধ্যে সোহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে এবং শত্রুতা দূরীভূত হবে।" (মোয়াত্তা ইমাম মালিক, হুসনু খুলখ অধ্যায়)। নবী করীম (সা.) আরো ইরশাদ করেন, "তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, কারণ উপহার মনের ময়লা দূর করে" (তিরমীযী, হেবা অধ্যায়) সুতরাং বুঝা গেল যে, স্বতঃস্ফূর্তচিত্তে খুশীমনে উপঢৌকন, উপহার, হাদিয়া আদান প্রদানে কোন দোষ নেই এবং কোন পাপও নেই। তবে দাবী করে, পণ করে, শর্ত আরোপ করে অসন্তুষ্টির মাধ্যমে বাধ্য করে বিয়ে উপলক্ষে জোর করে কিছু আদায় করা যৌতুকের অর্ন্তভুক্ত। সুতরাং যৌতুক হল অন্যের অর্থ বা সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া বিয়ে উপলক্ষে ভিন্ন কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করে ভোগ করা। এভাবে যৌতুক ও পণ ইত্যাদি কৌশলে অন্যের সম্পদ গ্রহণ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না। কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ (আল-কুরআন, ৪:২৯)। হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন মানুষের জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ খাওয়া বৈধ নয় তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে।" বিয়ের সময় কনের জন্য মাহরানা ধার্য করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, "আর ঐ নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীগণকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমরা স্বীয় স্বার্থের বিনিময়ে তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, এভাবেই তোমাদের পত্নী করে নাও শুধু কাম প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য নয়। অতঃপর যে পন্থায় তোমরা তাদেরকে উপভোগ করবে যেন উক্ত নারীগনকে তাদের নির্ধাতি মোহর প্রদান কর। আর নির্ধারিত হওয়ার পর যে পরিমাণে তোমরা পরস্পর সম্মত হয়ে যাও তাতে কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।" (আল-কুরআন ৪:২৪)।) সুতরাং উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাহর স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মেয়েদের ন্যায্য অধিকার। বর্তমান

সমাজে নারীদের এই ন্যায্য অধিকার থেকেও অনেকাংশ বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাহর দেয়ার ওয়াদা থাকলেও তা দেয় না; বরং এ বিষয়টি উপেক্ষা করে উল্টো যৌতুক দাবী করা হচ্ছে, যা ইসলামে মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। যৌতুক দাবী ইসলামের প্রবর্তিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। নবীজী এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি সম্মান লাভের জন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে আল্লাহ তার অপদস্থতাই বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে সম্পদ লাভের আশায় বিয়ে করে আল্লাহ তার দরিদ্রতাই বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে বংশ গৌরব লাভের আশায় বিয়ে করে আল্লাহ তার অসম্মানই বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে দৃষ্টি অবনমিত রাখার জন্য অথবা নৈতিক চরিত্র ঠিক রাখার জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে আল্লাহ তাকে সে স্ত্রীতে বরকত দিবেন আর স্ত্রীর জন্যও তাকে বরকতময় বানিয়ে দেবেন। অর্থাৎ সবদিক থেকেই এ বিয়ে বরকতময় হবে"।

যৌতুক শুধু ইসলামে নিষিদ্ধ নয়; বরং সামাজিকভাবেও তা গর্হিত ও বর্জিত কাজ। আমাদের বাংলাদেশে বর পক্ষকে এ যৌতুক দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে বহু নারীকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, অনেককে সংসার ছাড়তে হয়েছে, এমনকি যৌতুকের দাবী পূরণ করতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন পাশ হয়। এর পরেও যৌতুক প্রথা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায়নি। আইনটি নিম্নরূপ ঃ

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ (১) এই আইন ১৯৮০ সালের 'যৌতুক নিরোধ আইন' নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দিষ্ট তারিখ হইতে ইহা বলবৎ হইবে।

২. সংজ্ঞা ঃ বিষয় বস্তু প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে 'যৌতুক' বলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝাইবে, যাহা ঃ

(ক) বিবাহের এক পক্ষ অপর পক্ষকে, অথবা

(খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক, বিবাহের যে কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহ মজলিশে অথবা বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ে, বিবাহের পণরূপে প্রদান করে বা প্রদান করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়; তবে যৌতুক বলিতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরীয়াত) মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহর বা মোহরানা বুঝাইবে না।

পত্র-পত্রিকা ও দেশের সমাজের বিয়ে-শাদীর মজলিসে ও বিয়ে সম্পর্কিত কর্মকান্ডের দিকে তাকালে যৌতুকের বিভিন্ন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু কারণ তুলে ধরা হল-

১. সমাজে সুশিক্ষার অভাব, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, পরকালে আল্লাহর জবাবদিহিতার ভয়ের শুন্যতা, ইসলামী ও নৈতিক জ্ঞানের অভাব, সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও জ্ঞানের অভাবই হল যৌতুক প্রথার অন্যতম কারণ।

২. নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যৌতুকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

৩. মেয়েদের বয়স সীমা অতিক্রম হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক সময় মেয়ের বাবা-মা বাধ্য হয়ে যৌতুক দেয়।

৪. উচ্চশিক্ষা, উচ্চবংশ, উচ্চবিত্ত পরিবারের পাত্র খুঁজতে গিয়ে তার চেয়ে নিম্ন স্তরের মেয়েপক্ষ স্বেচ্ছায় যৌতুক দিয়ে থাকে। অনেক সময় মেয়েদের কম সৌন্দর্য্যের কারণে ছেলেপক্ষকে যৌতুক দিয়ে থাকে। আবার কোন কোন সময় দেখা যায় যে, কনেপক্ষ মেয়ের ভবিষ্যতের আশায়ও বর পক্ষকে যৌতুক দিয়ে থাকে।

৫. নারী শিক্ষার অভাব, যুবকদের বেকারত্ব, হীনমন্যতা, অন্য ধর্মের অনুকরণ ইত্যাদি যৌতুক গ্রহণের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৬. অনেকে আবার অর্থ লোভে কনেপক্ষের কাছে যৌতুক দাবী করে।

আমাদের সমাজের বিয়ে-শাদীর সংস্কৃতির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, যৌতুক গ্রহণ ও যৌতুক দেয়ার কারণে সমাজে কুপ্রথার চাল-চিত্র মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নিম্নে এর কিছু কুফল তুলে ধরা হল।

১. যৌতুকের নৈতিক কুফল এর কারণে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম নেয়। তাছাড়া যৌতুক উন্নত চরিত্রের প্রতিবন্ধকও বটে। এটা মানুষকে লোভী বানায়।

২. যৌতুকের কারণে মানুষ কনের গুণাবলীর পরিবর্তে কনের পিতার সম্পদকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে পরস্পর পস্পরের প্রতি উদারতা ও সাহনুভূতিশীল হওয়ার পরিবর্তে অত্যাচারী ও কঠোর হয়ে ওঠে। এতে পস্পরের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান হ্রাস পায়। এটা দম্পতি ও উভয়ের পরিবারকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়।

৩. পারিবারিক পর্যায়ে যৌতুক বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন, যৌতুকের কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষাদে

সমাজে নারীদের এই ন্যায্য অধিকার থেকেও অনেকাংশ বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাহর দেয়ার ওয়াদা থাকলেও তা দেয় না; বরং এ বিষয়টি উপেক্ষা করে উল্টো যৌতুক দাবী করা হচ্ছে, যা ইসলামে মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। যৌতুক দাবী ইসলামের প্রবর্তিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। নবীজী এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি সম্মান লাভের জন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে আল্লাহ তার অপদস্থতাই বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে সম্পদ লাভের আশায় বিয়ে করে আল্লাহ তার দরিদ্রতাই বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে বংশ গৌরব লাভের আশায় বিয়ে করে আল্লাহ তার অসম্মানই বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে দৃষ্টি অবনমিত রাখার জন্য অথবা নৈতিক চরিত্র ঠিক রাখার জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে আল্লাহ তাকে সে স্ত্রীতে বরকত দিবেন আর স্ত্রীর জন্যও তাকে বরকতময় বানিয়ে দেবেন। অর্থাৎ সবদিক থেকেই এ বিয়ে বরকতময় হবে"।

যৌতুক শুধু ইসলামে নিষিদ্ধ নয়; বরং সামাজিকভাবেও তা গর্হিত ও বর্জিত কাজ। আমাদের বাংলাদেশে বর পক্ষকে এ যৌতুক দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে বহু নারীকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, অনেককে সংসার ছাড়তে হয়েছে, এমনকি যৌতুকের দাবী পূরণ করতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন পাশ হয়। এর পরেও যৌতুক প্রথা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায়নি। আইনটি নিম্নরূপ ঃ

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ (১) এই আইন ১৯৮০ সালের 'যৌতুক নিরোধ আইন' নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দিষ্ট তারিখ হইতে ইহা বলবৎ হইবে।

২. সংজ্ঞা ঃ বিষয় বস্তু প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে 'যৌতুক' বলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝাইবে, যাহা ঃ

(ক) বিবাহের এক পক্ষ অপর পক্ষকে, অথবা

(খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক, বিবাহের যে কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহ মজলিশে অথবা বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ে, বিবাহের পণরূপে প্রদান করে বা প্রদান করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়; তবে যৌতুক বলিতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরীয়াত) মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহর বা মোহরানা বুঝাইবে না।

পত্র-পত্রিকা ও দেশের সমাজের বিয়ে-শাদীর মজলিসে ও বিয়ে সম্পর্কিত কর্মকান্ডের দিকে তাকালে যৌতুকের বিভিন্ন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু কারণ তুলে ধরা হল-

১. সমাজে সুশিক্ষার অভাব, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, পরকালে আল্লাহর জবাবদিহিতার ভয়ের শুন্যতা, ইসলামী ও নৈতিক জ্ঞানের অভাব, সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও জ্ঞানের অভাবই হল যৌতুক প্রথার অন্যতম কারণ।

২. নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যৌতুকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

৩. মেয়েদের বয়স সীমা অতিক্রম হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক সময় মেয়ের বাবা-মা বাধ্য হয়ে যৌতুক দেয়।

৪. উচ্চশিক্ষা, উচ্চবংশ, উচ্চবিত্ত পরিবারের পাত্র খুঁজতে গিয়ে তার চেয়ে নিম্ন স্তরের মেয়েপক্ষ স্বেচ্ছায় যৌতুক দিয়ে থাকে। অনেক সময় মেয়েদের কম সৌন্দর্য্যের কারণে ছেলেপক্ষকে যৌতুক দিয়ে থাকে। আবার কোন কোন সময় দেখা যায় যে, কনেপক্ষ মেয়ের ভবিষ্যতের আশায়ও বর পক্ষকে যৌতুক দিয়ে থাকে।

৫. নারী শিক্ষার অভাব, যুবকদের বেকারত্ব, হীনমন্যতা, অন্য ধর্মের অনুকরণ ইত্যাদি যৌতুক গ্রহণের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৬. অনেকে আবার অর্থ লোভে কনেপক্ষের কাছে যৌতুক দাবী করে।

আমাদের সমাজের বিয়ে-শাদীর সংস্কৃতির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, যৌতুক গ্রহণ ও যৌতুক দেয়ার কারণে সমাজে কুপ্রথার চাল-চিত্র মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নিম্নে এর কিছু কুফল তুলে ধরা হল।

১. যৌতুকের নৈতিক কুফল এর কারণে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম নেয়। তাছাড়া যৌতুক উন্নত চরিত্রের প্রতিবন্ধকও বটে। এটা মানুষকে লোভী বানায়।

২. যৌতুকের কারণে মানুষ কনের গুণাবলীর পরিবর্তে কনের পিতার সম্পদকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে পরস্পর পস্পরের প্রতি উদারতা ও সাহনুভূতিশীল হওয়ার পরিবর্তে অত্যাচারী ও কঠোর হয়ে ওঠে। এতে পস্পরের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান হ্রাস পায়। এটা দম্পতি ও উভয়ের পরিবারকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়।

৩. পারিবারিক পর্যায়ে যৌতুক বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন, যৌতুকের কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষাদে

পরিণত হয়, পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হয়, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকেনা। পরস্পরের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়, অনেক সময় বিয়ে পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। অনেক সময় যৌতুকের দাবী উত্তাপনে পরস্পরের আলোচনা এমন পর্যায়ে গড়ায় যে, হাতাহাতি ও মারামারিও হয়ে যায়। ফলে আহত নিহতের ঘটনা ঘটে।

৪. যৌতুকের সামাজিক সমস্যাও কম নয়। যেমন, এতে স্ত্রীর যথাযথ মূল্যায়ন হয় না, নির্যাতন বেড়ে যায়, অপ্রীতিকর ও হত্যার ঘটনা ঘটে, অর্থের অপচয় হয়, বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ে, সামাজিক সুখ শান্তি নষ্ট হয়, যৌতুক দিতে গিয়ে বহু পরিবার অসহায়ের মধ্যে পড়ে, মামলা-মুকাদ্দমার ঘটনা ঘটে, অসৎ লোকদের দৌরাত্ম বেড়ে যায়, যৌতুক দেয়া নেয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। যা সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৫. যৌতুকের কারণে অর্থনৈতিক সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, এতে কনে ও বরপক্ষের উভয়ের পরিবারে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। এতে কনেপক্ষ অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়, মানুষের কাছে ঋণগ্রস্থ হয়। এটা যুবকদের বেকারত্বও বাড়ায়। অবৈধ আয়ের উৎসাহ দেয় ইত্যাদি।

যৌতুক প্রথা বন্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে যৌতুক প্রতিরোধে সমাজের সকল স্তরের মানুষের এগিয়ে আসতে হবে। নিম্নে যৌতুক প্রতিরোধ ও বন্ধের কতিপয় উপায় ও সুপারিশ পেশ করা হলো। যেমন,

১. যৌতুকের কুফল সম্পর্কে নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। বিশেষ করে যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষিত নারীদের কর্ম সংস্থান তাদেরকে সাবলম্বী করে তুলে। ফলে তাদের কাছ থেকে যৌতুক দাবীও কমে যায়।

২. যৌতুক প্রতিরোধের জন্য সুশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. যৌতুকের অসারতা প্রমাণ করে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতনতা গড়ে তোলা।

৪. যুকবদের বেকারত্ব দূর করে তাদের কর্মমূখী করা। ফলে কনের কাছ থেকে চাওয়া-পাওয়াও হ্রাস পাবে।

৫. প্রচার মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকায় যৌতুক বিরোধী আন্দোলন জোরদার করা।

৬. মসজিদের খুতবায়, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যৌতুকের কুফল তুলে ধরা।

৭. যৌতুক বিরোধী আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

৮. যৌতুক যে একটি সামাজিক অপরাধ সে বিষয়ে যে কোন সামাজিক আলোচনায় তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

৯. যৌতুক গ্রহনকারীকে সম্মানের চোখে না দেখা।

১০. যৌতুক গ্রহণকারী অপরাধীদের সামনে আল্লাহভীতি ও পরকালের জবাবদিহিতার বিষয়টি তুলে ধরা।

১১. দেশের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও এন.জি.ও কে যৌতুক বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা।

১২. মেয়েদেরকে গৃহকর্মের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা। এক্ষেত্রে তাদের চাকরী না হলেও উৎপাদনশীল শ্রমের মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতার কারণে বরপক্ষ যৌতুকের পরিবর্তে কনের গুণ বিবেচনায় বিয়ে করতে আগহী হবে। ফলে যৌতুকের ধ্যান ধারণা অনেকটা কমে আসবে।

১৩. সরকারী ও বেসরকারীভাবে অবিবাহিত যুবকদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। ফলে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার কারণে যুবকরা বিয়ের সময় যৌতুক গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

১৪. যৌতুক প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ওয়ার্কশপ, চিত্র প্রর্দশনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যৌতুকের কুফল তুলে ধরা।

১৫. সারাদেশে ইউনিয়ন, গ্রাম ও মহল্লা পর্যায়ে সরকারী সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে যুব ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিবাহ সংস্থা গড়ে তুলে যৌতুক বিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৬. বহু বিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। কারণ, অনেক সময় অর্থলোভী স্বল্প আয়ের পরিবারের যুবক/পুরুষরা যৌতুকের জন্য বহু বিবাহে আগ্রহী হয়।

১৭. নারীদের যোগ্যাতানুসারে ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা।

১৮. যৌতুক গ্রহণকারী ও দাতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ। এর বিরুদ্ধে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের বিবেকবানদের এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

আ'লা হযরত কনফারেন্স ও আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রঃ)-এর স্মরণে সুন্নী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত

আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী (রহঃ) ছিলেন চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ও সুন্নী আকিদার ইমাম। তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের হৃদয়ে রাসুল প্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন এবং ঈমানকে সঞ্জীবত করেন। বৃটিশরা যখন ধর্মীয় অঙ্গনে বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্যে দেওবন্দী উলামাদেরকে ভাড়া করে কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা দিচ্ছিল এবং মুসলমানদের ঈমান ও আকিদা কলুষিত করছিল, ঠিক তখনই আ'লা হযরত আজিমুল বরকত শাহ্ আহমদ রেযা খান (রহঃ) তাদের বিরুদ্ধে কলমী যুদ্ধের ময়দানে অবতীন হন এবং ইসলামের অপব্যাখ্যাকারীদেরকে সমূলে উৎখাত করেন। আর আ'লা হযরতকে বাংলাদেশের সর্বস্তরের সুন্নি জনতার মাঝে পরিচিত করে তুলেন উস্তাজুল ওলামা অকুতোভয় মর্দে মুজাহিদ বাতিলের আতঙ্ক, শায়খুল ইসলাম, সুন্নীয়তের মহান দিকপাল হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল (রহঃ)। তাঁর লেখনী ও ওয়াজের মাধ্যমেই বাংলার জমিনে আ'লা হযরত (রঃ) এর আকিদা ও প্রেম জাগ্রত হয় সুন্নী মুসলমানদের হৃদয়ে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, বাংলাদেশ আয়োজিত গত ১৭এপ্রিল আ'লা হযরত কনফারেন্স ও অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রহঃ)-এর স্মরণে সুন্নী মহা সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে মহা সম্মেলনে আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান (রহঃ) ও অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রহঃ)-এর কর্মময় জীবনের উপর বিষদ আলোচনা করা হয়। বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে আ'লা হযরত ও অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল (রহঃ) কে ইসলামী পন্ডিত ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ ছাড়াও সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সভায় আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান (রহঃ)-এর ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান এবং তাঁর গবেষণা কর্মের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। আ'লা হযরত (রহঃ)কে আইনবিদ, ইতিহাসবিদ, পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদ এবং আরবী ব্যাকরণবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এবং তাঁর গবেষণা কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সম্মেলনে অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রহঃ)-এর সুন্নী গবেষণা কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা করা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম এই দেশে বার্ষিক আ'লা হযরত কনফারেন্স চালু করেন। আ'লা হযরতের আকায়েদ ও আদর্শকে সমুন্নত রাখার নিমিত্তে অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল "আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ফাউন্ডেশনকে গতিশীল করার জন্যে সভায় সকলের প্রতি আহবান জানান। পাশাপাশি অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল (রঃ)-এর নামে "স্মৃতি পরিষদ" গঠন করে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ও বাংলার লাখো মানুষের হৃদয়ে এই অকূতভয় সুন্নী সৈনিককে স্মরণে রাখার জন্যে আহবান জানানো হয়।

উক্ত কনফারেন্সে চট্টগ্রামের সুন্নী আলেম মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা শাফিউল আলম নিযামীর উপরে হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন এবং হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

আ'লা হযরত কনফারেন্স ও আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রহঃ)-এর স্মরণে সুন্নী মহা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ মোঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর এম.পি সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পীরে তরিকত মাওলানা হেলাল উদ্দিন, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ, পীরে তরিকত আলহাজ্ব মাওঃ আবদুল হামিদ আল-কাদেরী, মগবাজার, ঢাকা, পীরে তরিকত মাওলানা ছদরুল আমিন রেজভি, রেজভিয়া দরবার শরীফ, নেত্রকোনা, পীরে তরিকত মোবারক আলী, নবীনগর, বি. বাড়িয়া এছাড়া আরও অনেক পীর মাশায়েক।

সম্মেলনে আলোচনা করেন হযরত মাওঃ কাজি মোবারক হোসেন ফরাজী, মহাসচিব, আহলে সুন্নাত আল জামায়াত, মুফতি মাওলানা ফারুখ আহম্মদ, মাওঃ এ্যাডঃ আবদুল আউয়াল, মাওঃ আনোয়ার হোসেন আল কাদেরী, এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী, অধ্যক্ষ এ্যাডভোকেট ডঃ মিয়া মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রব, আলহাজ্ব মোঃ ইকবাল, মোহাম্মদ আবুল হাশেম, ড. এম.এ. আউয়াল ও এড. জালাল। আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রহঃ)-এর স্মৃতি রক্ষার্থে অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল স্মৃতি পরিষদ গঠনের উপর বক্তাগণ জোর দাবি জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পীরে তরিকত আলহাজ্ব হযরত মাওঃ সেকান্দার হোসাইন আল-কাদেরী।

প্রশ্নোত্তর (আক্বিদা আমল)

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

১নং প্রশ্ন ঃ কাদিয়ানী মতবাদ বলতে কী বুঝায়? এদের আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে জানালে খুশী হব।

ফাহিম সরকার, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

উত্তর ঃ কাদিয়ানী মতবাদ একটি বাতিল ও কুফুরী মতবাদ। পাঞ্জাবের মীর্জা গোলাম আহমদ কায়িদানী এ মতবাদের প্রবর্তক। এদের প্রধান ভ্রান্ত আকীদা হল মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী "একজন নবী"। ইহুদী নাছারার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদদপুষ্ঠ এ দল বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশে বিষফোঁড়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। এদের চাঁকচিক্যের গোলক ধাঁধাঁয় পতিত হয়ে ইতিমধ্যে অনেক সরলমনা মুসলমান ঈমান আকীদা হারিয়ে সর্বশান্ত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত সকল মুফতী এবং ওলামায়ে কেরাম এদেরকে কাফির ফতেয়া দিয়েছেন। এমনকি অনেক দেশে তাদেরকে রাষ্ট্রিয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের দেশের সুন্নী ওলামায়ে কেরাম বার বার এদের ব্যাপারে সরকারকে তগিদ দিয়ে আসছেন। বিগত কোন সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করছে না। আমরা আবারো বর্তমান সরকারের নিকট আবেদন করতে চাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী এ দলকে অবিলম্বে অমুসলিম ঘোষণা করা হোক। নিম্নে কাদিয়ানীদের মারাত্মক আকীদার কতিপয় নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম যা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী স্বয়ং তার লিখিত বিভিন্ন বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছে।

১. আমি তো সুসংবাদের ভিত্তিতে এসেছি, ঈসা (আঃ) কোথায়, যে আমার মিম্বরে পা রাখবে? *(সূত্রঃ ইযালায়ে আওহাম ১৫৮ পৃষ্ঠা)।*

২. আমার ভ্রমণ কারবালায় হয়। একশত হুসাইন আমার পকেটে আছে। *(দুররে সামীন-১৭১ পৃষ্ঠা)*

৩. আমি মসীহে যমানা, আমি কালিমুল্লাহ অর্থাৎ মুসা (আঃ) আমি মুহাম্মদ ও আহমদ মোজতবা। *(তিরয়াকুল কুলুব ৩য় পৃষ্ঠা)*

৪. আমার আগমনে সকল নবী জীবত হয়ে গেছেন, সকল রাসূল আমার জামায় লুকায়িত। *(দুররে সামীন ১৭৩ পৃষ্ঠা)।*

আরো বহু ভ্রান্ত ও ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদা রয়েছে। এক কথায় এরা ভন্ডনবীর দাবীদার। আলাদা নবী-আলাদা কুরআনও তৈরী করে নিয়েছে, যার নাম তাযকিরা। মুসলমানরা তাওরাত যযুর ইঞ্জিল ও পবিত্র কুরআনকে যেভাবে সম্মান করে কাদিয়ানীদের নিকট তাযকিরার মর্যাদাও তেমন। তারা নিজেদেরকেই কেবল মুসলমান মনে করে; বাকী সবাইকে কাফির মনে করে। এরা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কখনো নবী, কখনো সংস্কারক,কখনো মসীহে মওউদ ইত্যাদি বলে থাকে। এক কথায় এরা ইসলাম ও মুলমানদের দুশমন। এরা মুরতাদ। এরা কাফির; এরা ইহুদী নাছারার সৃষ্টি। এদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা আজ সময়ের দাবী।

২নং প্রশ্ন ঃ আমি অধিকাংশ সময় দুঃশ্চিন্তায় ভুগী। অহেতুক কোন বিষয় নিয়েও অনেক সময় টেনশন করি। এ থেকে মুক্তির জন্য আমি কোন দোয়া পড়তে পরি? দয়া করে জানাবেন - রফিকুল ইসলাম, ভাঙ্গা, ফরিদপুর

উত্তর ঃ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকাল-সন্ধ্যা একবার করে নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করা বেশ উপকারী এবং এটা পরীক্ষীত আমল। দু'আটি পড়ার আগে ও পরে এগার বার করে দরূদ শরীফ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি ওয়া আউযুবিকা মিনাল ইযজী ওয়াল কাছলি ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবুনি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযু বিকা মিন গালবাতিদ দাইনি ওয়া কাহারির রিজালি।

৩নং প্রশ্ন ঃ আহলে হাদীস বলতে কাদেরকে বুঝায়? আমাদের দেশে কিছু লোক মাযহাব অনুসরণ করেনা। এরা নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' দাবী করে। তাদের দাবী কতটুকু যুক্তিযুক্ত জানতে আগ্রহী।

তারেক মাহমুদ, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর ঃ যারা মাযহাব মানেনা তারা লা-মাযহারী। ইসলামে চার মাযহাব তথা হানাফী শাফেঈ-মালেকী হাম্বলী মাযহারের যে কোন একটি অনুসরণ করাকে বলা হয় তাকলিদ। বিশ্বের প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম এই মাযহাব চতুষ্ঠয়ের যে কোন একটির অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা তথা ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। অথচ, আহলে হাদীস দাবীদাররা ওলামায়ে কেরামের সেই ইজমাকে মানেনা এবং কোন মাযহাবও মানে না। মূলতঃ এরা হল গায়রে মুকাল্লিদ তথা মাযহাব বিরুধী। বস্তুতঃ মাহযাবের প্রতিটি মাসআলার মূল উৎস হলো কুরআন-হাদীস। সুতরাং, যারা মাযহাব মানেনা তারা নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' নামে আখ্যায়িত করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, বরং হাস্যকর। এরা বিপথগামী; ভ্রান্ত। সহী হাদীসের দোহায় দিয়ে এরা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে করীমা এবং অনেক সহী হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। আমাদের দেশে এদরেকে চেনার কতিপয় নমুনা হলো–

১. নামাজে বুকের উপর হাত বাঁধা
২. রুকু-সিজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাত উত্তোলন করা।
৩. জামাত সহকারে নামাজ পড়ার সময় ইমাম সাহেবের সাথে কিরআত পড়া এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত শেষে উচ্চস্বরে 'আমিন' বলা।
৪. বড় আওয়াজে 'বিসমিল্লাহ' পড়া
৫. তারাবীর নামাজ আট রাকাত পড়া
৬. বিতির নামাজ 'এক রাকাত পড়া' ইত্যাদি।

অবশ্য এখানে কিছু কিছু মাযহাবের সথে মিল রয়েছে। তারা একটি মাযহাবের ভিত্তিতে এসব আমল করছেন বলে তাদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই। বরং অভিযোগ তাদের ব্যাপারে যারা কোন মাযহাবই মানেনা। এরা কথায় কথায় বুখারী শরীফের দোহাই দিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ খোঁজে আর হানাফী মাযাহারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। অথচ, হানাফী মাযহাবের প্রতিটি মাসআলা কুরআন-সুন্নাহ্ সমর্থিত।

৪নং প্রশ্ন ঃ ইদানিং কিছু কিছু টিভি চ্যানেলে শোনা যায় ইসলামের দৃষ্টিতে কদমবুচি জায়েজ নেই। বরং শেরেকের পর্যায়ভুক্ত। অথচ, আমরা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি ছেলে মেয়েরা মা-বাবাকে দাদা-দাদী, নানা-নানী তথা মুরব্বীদেরকে কদমবুচি করে আর ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক মন্ডলীকে কদমবুচি করে। আসলে কোনটি সঠিক জানালে খুবই উপকৃত হব। - জামাল উদ্দীন, দুবাই

উত্তর ঃ সালাম বিনিময়ের পর মা-বাবা, ওস্তাদ তথা মুরব্বীদেরকে পায়ে ধরে কদমবুচি করাকে নাজায়েয, অবৈধ কিংবা শেরকের শামিল মনে করা নিঃসন্দেহে অজ্ঞতার নামান্তর। কারণ, কোন একটা কাজ নাজায়েয কিংবা অবৈধ ঘোষণার পূর্বে শীয়তের দলির উপস্থাপন করতে হবে। মুরুব্বীদের কদমবুচি অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন দলিল তো না-ই; বরং কদমবুচির পক্ষে অনেক দলিল রয়েছে। যেমন-

দলিল নং-১

عَنِ الْوَازِعْ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْنَا فَقِيْلَ ذَاكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا۔

অর্থাৎ হযরত ওয়াজে ইবনে আমের (রা:) বলেন, আমরা আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল (মদীনায়) পৌছলে বলা হয়, ইনিই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা তাঁর হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয় ধরে তাতে চুমা দিলাম।

সূত্র ঃ আল আদাবুল মুফরাদ মূলঃ ইমাম বুখারী (রাঃ), অনুবাদ - মৌ মুহাম্মদ মুসা পৃষ্ঠা-৩৪৫

[উল্লেখ্য যে, উক্ত বইয়ের শুরুতে ওহাবী মৌলভী বাইতুল মোকাররমের সাবেক খতিব মৌং ওবাইদুল হক সাহেবের অভিমতও রয়েছে]

দলিল নং-২

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ

অর্থাৎ, হযরত সুহাইব (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রঃ)কে আব্বাস (রাঃ) এর হাত ও উভয় পায়ে চুমা দিতে দেখেছি। *(প্রাগুক্ত)*

দলীল নং-৩

জনৈক বেদুঈন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র দরবারে এসে নবীজির কাছে একটি

মুজিযা প্রকাশের আবেদন করলে নবীজি উক্ত বেদুঈনকে বললেন-ওই বৃক্ষটিকে বলো আল্লাহর রাসূল তোমাকে ডাকছেন। বেদুঈন নির্দেশ মতে বৃক্ষের কাছে গিয়ে তাই বললেন- সাথে সাথে বৃক্ষটি ডানে-বামে, সামনে-পিছনে নাড়া দিয়ে শিকড়গুলো ছিঁড়ে ধুলি উড়িয়ে উড়িয়ে নবীজির সামনে এসে হাজিরা দিয়ে বলে উঠল 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ'। এবার বেদুঈন বললেন 'হে আল্লাহর রাসূল। এবার বৃক্ষকে নির্দেশ দেন, সে যেন আপন জায়গায় ফিরে যায়, নবীজির নির্দেশ হল অমনি বৃক্ষ আপন জায়গায় ফিরে গিয়ে শিকড়গুলোর সাথে আবারো জোড়া লেগে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে গেল। এ ঘটনা দেখে বেদুঈন বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে সিজদা করব। উত্তরে নবীজি ইরশাদ করলেন আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার হুকুম দিতাম তাহলে প্রত্যেক নারীকে হুকুম দিতাম- সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। এবার বেদুঈন আবেদন করলো-

فَأْذَنْ لِيْ اَنْ اُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ فَاَذِنَ لَهٗ.

তাহলে আমাকে আপনার হাত মোবারক ও পা মোবারক চুম্বন দেয়ার অনুমতি দিন। নবীজি তাকে অনুমতি দিলেন।

সূত্র ঃ শিফা শরীফ, দালায়েলুন নবুয়ত পৃষ্ঠা-৩৩২

সুতরাং বুঝা গেল পিতা-মাতা, পীর-মুরশিদ, ওস্তাদ ও মুরব্বীদেরকে কদমবুচি করা নিঃসন্দেহে বৈধ এবং এটা একটা উত্তম শিষ্টাচারের অন্তর্ভূক্ত।

৫নং প্রশ্নঃ আযান ও ইকামতের মধ্যে আশাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলার সময় আমরা উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন দিয়ে চোখে লাগিয়ে থাকি। কিন্তু তাবলীগ পন্থীরা বলে এ আমলের কোন প্রমাণ নেই। তাই প্রমাণ সহকারে জানালে খুশী হব।

জহির উদ্দীন, নারায়ণগঞ্জ, বন্দর।

উত্তর ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যে প্রিয়নবীজির নাম মোবারক শুনে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন দিয়ে চোখে লাগানো মুস্তাহাব ও বরকতময় আমল, বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামীতে রয়েছে-

يُسْتَحَبُّ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْاُوْلٰى مِنَ التَّشَهُّدِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّتْ عَيْنِى بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِى بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظُفْرَىْ اَلْاِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُوْنُ قَائِدًا لَهٗ اِلَى الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ- আযানের প্রথম শাহাদত শুনার সময় সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ আর দ্বিতীয় শাহাদত শুনার সময় কুররাত আইনী বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ অতঃপর আল্লাহুম্মা মাততী'নী বিস্‌সময়ী ওয়াল বাসরি বলবে এবং নিজের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ দু'চোখের উপর লাগাবে-এটা করা মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি এভাবে করবে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে ইরশাদ করেন-আমি জান্নাতে তাকে সাথে করে নিয়ে যাব। *সূত্র ঃ রাদ্দুল মোহতার ১ম খন্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা, সালাত পর্ব আযান অধ্যায়।*

তাছাড়া আল্লামা সৈয়দ আহমদ তাহতাভী স্বীয় কিতাব তাহতাভী আলা মারাকীইল ফালাহ- এ ইমাম শামীর উপরোক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করে আরো লিখেন-ইমাম দাইলমী মসনদে ফেরদাউস এ হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা) থেকে মরফু সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন-নবীজি ইরশাদ করেন-যে ব্যক্তি মুয়াযযিন আশাহাদু আন্না মুহামাদার রাসূলুল্লাহ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুলের পেট চুম্বন করার পর চোখের উপর মাসেহ করবে এবং বলবে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু রাদি'তু বিল্লাহি রাব্বান ওয়াবিল ইসলামে দ্বীনান ওয়াবি-মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীয়ান- তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী ক্বারী (রাঃ) মাউযুয়াতে কবির কিতাবে লিখেন-

اِذَا ثَبَتَ رَفْعُهٗ اِلَى الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَيَكْفِى لِلْعَمَلِ بِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

অর্থাৎ, এ হাদীস হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে

যেহেতু মরফূ হিসেবে বর্ণিত, সেহেতু আমল করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কেননা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমাদের উপর আমার সুন্নত এবং আমার খেলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের অনুসরণ করা অপরিহার্য।

উল্লেখিত দলীলাদির আলোকে বুঝা গেল আযানে নবীজির নাম মোবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে চোখে লাগানো মুস্তাহাব। মূল উদ্দেশ্য হল নবীজির প্রতি মুহব্বত। সুতরাং সেই মুহব্বতের কারণে আযান ছাড়া অন্য সময়েও কেউ যদি নবীজির নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে চোখে লাগায় এটা অবৈধ হবে না। বরং বরকতময় আমল হিসেবে গণ্য হবে। অতএব নবীপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এমন আমলের বিরুধীতা করা এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ করা নিঃসন্দেহে নবীর শানে বেআদবী।

প্রশ্ন ঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের উছিলা ধরা শরীয়ত মতে জায়েয কি না? আনোয়ার হোসেন, জহুরীমহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর ঃ আম্বিবয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামকে উছিলা ধরা, তাদের নিকট ফরিয়াদ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা- ইহকালীন ও পরকালীন- উভয় ক্ষেত্রেই শরীয়ত মতে ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ঐক্য মতে জায়েয। আহলে সুন্নাতকে হাদীস শরীফে ছেওয়াদে আজম বা সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানের দল বলা হয়েছে এবং তাদের অনুসরন করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। তাঁদের ঐক্যমত বা ইজমা সত্যের দলীল। কেননা, অসত্যের উপর সকলে ঐক্যমত হতে পারেনা। তাদের ইজমা ভুলত্রুটি হতে মুক্ত। এ প্রসঙ্গে নবী করিম (দঃ)-এর কয়েকখানা হাদীস শরীফ প্রনিধান যোগ্য।

১। ইমাম আহমদ ও তাবরানী কর্তৃক রেওয়ায়াতকৃত হাদীস নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

سَأَلْتُ رَبِّىْ لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلٰى ضَلَالَةٍ فَاَعْطَانِيْهَا (امام احمد والطبرانى)

অর্থ ঃ আমি আমার রবের দরবারে এই ফরিয়াদ করেছি যে, আমার সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত যেন কোন বাতিল বিষয়ে একমত না হয়। আল্লাহ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন- (ইমাম আহমদ ও তাবরানী। এতে বুঝা গেল যে বিষয়ে জমহুরে উম্মত একমত হয় তা বাতিল নয়।

২। ইমাম হাকেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে নবী করিম (দঃ) এর বানী উদ্ধৃত করেছেন এভাবে-

لَايَجْمَعُ اللّٰهُ اُمَّتِى عَلٰى ضَلَالَةٍ اَبَدًا وَوَرَدَمَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ۔ (رواه الحاكم عن ابن عباس)

অর্থ ঃ "আল্লাহ তায়ালা আমার সমস্ত উম্মতকে গোমরাহীর বিষয়ে কখনও ঐক্যমত্য করবেন না"। আরও এরশাদ করেছেন ঃ "মুসলমানগণের মতে যাহা ভাল ও উত্তম, তাহা আল্লাহর নিকটও উত্তম বলে গণ্য: (হাকেম ও তবরানী)।

এতে প্রমাণিত হলো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত কখনও বাতিল বিষয়ে একমত হবেনা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ যে বিষয়কে ভাল বলেন- তাহা আল্লাহর নিকটও ভাল। যেহেতু মুসলমানগণের পূর্ববর্তী সকলের মতেই আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের উছিলা ধরা উত্তম- সেহেতু আল্লাহর নিকটও উহা উত্তম। ইহা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন ঃ উছিলা ধরার অর্থ কি? কিভাবে উছিলা ধরা হয়?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ প্রিয় বান্দাগনকে স্মরণ করে তাদেরকে মাধ্যম বানিয়ে বরকত লাভ করার নাম উছিলা। আল্লাহতায়ালা তাদের কারনেই আপন বান্দাদেরকে রহম করেন। অতএব- ঐ সব নেক বান্দাগণকে উছিলা ধরার সরল অর্থ হচ্ছে- তাদেরকে মাধ্যম বা চ্যানেল ধরে মনোবাঞ্ছা পূরনের জন্য এবং মাকসুদ হাসিলের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা। কেননা, তারা আমাদের তুলনায় আল্লাহর অতি নিকটে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া ও সুপারিশ কবুল করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে একখানা হাদীস শরীফ উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ

বোখারী শরীফে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে একখানা হাদীসে কুদ্সী উল্লেখ করে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

(قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى) مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَاتَقَرَّبَ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا

পাওয়া যায়। যথা ঃ

১। ইমাম তিরমিজি, ইমাম নাছায়ী, ইমাম বায়হাকী ও ইমাম তাবরানী সহীহ সনদের মাধ্যমে সাহাবী হযরত ওসমান ইবনে হানাফী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَكْشِفَ عَنْ بَصَرِىْ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَاِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ فَاَمَرَهُ ﷺ اَنْ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ وَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِى الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّى اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِى حَاجَتِىْ هٰذِهِ لِتُقْضٰى لِىْ. اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِىَّ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ كَشَفَ اللّٰهُ عَنْ بَصَرِهِ. وَفِى رِوَايَةِ الْبَيْهَقِى فَقَامَ وَقَدْ اَبْصَرَ.

অর্থ ঃ "ওসমান ইবনে হানীফ (রাঃ) বলেন ঃ এক অন্ধ সাহাবী নবী করিম (দঃ) -এর খেদমতে এসে আরজ করলো- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন- যেন তিনি আমার অন্ধত্ব দুর করে দেন। হুজুর আকরাম (দঃ) তাকে বললেন- যদি তুমি চাও, তাহলে আমি দোয়া করবো। আর যদি ইচ্ছা করো, তাহলে সবর করতে পারো। এটা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। উক্ত সাহাবী বললেন- বরং আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করুন। তার অনুরোধে নবী করিম (দঃ) তাকে উত্তমরূপে অজু করে এই দোয়া পড়তে শিখিয়ে দিলেন- "হে আল্লহ। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং তোমার নবী যিনি রহমতের নবী- সেই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-কে উছিলা করে তোমার দিকে আমি মুতাওয়াজ্জাহ্ (মনোযোগী) হলাম। হে প্রিয় মুহাম্মদ (দঃ), আমি আমার এই মাকসুদ পূরনের জন্য আপনার মাধ্যমে (উছিলায়) আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ হলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার মাকসুদ পূরনের ব্যাপারে হুজুর (দঃ)-এর সুপারিশ কবুল করো"। এই দোয়া করে ঐ সাহাবী চলে গেলেন। তারপর পুনরায় ফিরে আসলেন। ইত্যবসরে আল্লাহ তার চক্ষু ভাল হয়ে গেলো। (তিরমিজি, নাছায়ী, বায়হাকী, তবরানী)

اِفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِىْ بِهَا وَلَئِنْ سَاَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهُ (رواه البخارى)

অর্থ ঃ "আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করেছেন ঃ যে কেউ আমার কারনে আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষন করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানাই। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আমার সার্বাধিক প্রিয় যে ইবাদত করে- তা হচ্ছে আমার নির্ধারনকৃত ফরজ ইবাদত। আর তার ইচ্ছাকৃত নফল ইবাদতের মাধ্যমেও ক্রমশঃ বন্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে যায়। আর যখন সে আমার বন্ধু হয়ে যায়- তখন আমি তার শ্রবন শক্তি (কান) হয়ে যাই- যার মাধ্যমে সে শুনতে যায়। আমি তার দৃষ্টিশক্তি (চোখ) হয়ে যাই- যার মাধ্যমে সে দেখতে যায়। আমি তার ধারন শক্তি (হাত) হয়ে যাই- যার মাধ্যমে সে ধরে। আমি তার চলনশক্তি (পা) হয়ে যাই- যার মাধ্যমে সে চলাচল করে। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে আমি আশ্রয় দেই"।- বোখারী শরীফ।

এতে প্রমাণিত হলো- আল্লাহর প্রিয় বান্দার ডাক আল্লাহ শুনেন। তাঁরা আল্লাহতে মিশে যান (ফানা হয়ে যান)। তাঁদের মধ্যে খোদা প্রদত্ত (কুদরতি) শ্রবন শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি এসে যায়। এগুলোকে কারামত বলে। অতএব- তাঁদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করেন। যেমন- লোহা আগুন নয়। কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে এলে সে আগুনের শক্তি লাভ করে। তখন সেও আগুনের ন্যায় জ্বালাতে পারে। তদ্রুপ- আল্লাহর অলীগণ আল্লাহ নহেন। কিন্তু ফানা ফিল্লাহ হয়ে গেলে খোদায়ী কুদরতী শক্তি লাভ করেন। তারা খোদার নিকট যা চান- তা পান। সেজন্যই লোকেরা মাজারে যান- অনুবাদক।

প্রশ্ন ঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামকে উছিলা ধরার কোন দলীল প্রমাণ আছে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, আছে। অসংখ্যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমান

পোঃ রেজিঃ নং- ডি এ ঢাকা ৫০২৮, ৩৮ তম সংখ্যা, এপ্রিল'১০ ইং, মূল্য ১২.০০ টাকা

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল সাহেবের লিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং আক্বিদা শুদ্ধ করুন

বই	হাদিয়া
হায়াত মঊত কবর হাশর	৪০০.০০
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	২৫০.০০
আ'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'	১৩০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	১২০.০০
ফতোয়ায়ে ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া	৮০.০০
আহকামুল মাযার	৮০.০০
শিয়া পরিচিতি	৬০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	৬০.০০
ফতোয়া ছালাছা	৩০.০০

- বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত (নিঃশেষ)
- গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস (নিঃশেষ)
- ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (সাদা) (নিঃশেষ)
- ফতোয়াউল হারামাঈন (নিঃশেষ)
- কালেমার হাকীকত (নিঃশেষ)
- কারামাতে গাউসুল আযম (নিঃশেষ)
- সফর নামা আজমীর (নিঃশেষ)
- ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লাহরী (নিঃশেষ)
- মহাসমর কাব্যের ব্যাখ্যা (পাণ্ডুলিপি)

প্রাপ্তি ঠিকানা ঃ উজ্জীবন লাইব্রেরী, মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল ঃ ০১৮১৫৪১০২৬২

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রব, "মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, (২য় লেন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৮০৬৪৪৪

বিঃদ্রঃ ৫০০০ টাকার পাইকারগণের জন্য ২০% কমিশন। ৫০০ টাকা হলে বিনা কমিশনে ভিপি করেও পাঠানো হয়।

সুন্নী মুবাল্লিগ ও সুন্নীবার্তার এজেন্সী ঠিকানা-১

- উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা।
- গাউসুল আযম হাফেজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা ও জামে মসজিদ, সেকদী, কচিলাজ, চাঁদপুর।
- মাওঃ হেলাল উদ্দিন, চিনাকান্দা পুরিয়া দরবার শরীফ, কোনাপিপা, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।
- মাওলানা হাবিব মিয়া, বড় কাপন জামে মসজিদ, সিলেট রোড, মৌলভীবাজার।
- মোঃ আঙ্গুর মিয়া, গাউছিয়া জামে মসজিদ, নাটির পাড়, ভৈরব বাজার, পোঃ ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।
- মাওঃ মোঃ নওশেরুজ্জামান, সেকটি সিরাজুম্মুনী দাখিল মাদ্রাসা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
- মিডিয়া প্লাস, নুর ম্যানশন, পোঃ চকবাজার, জেলাঃ কুমিল্লা সদর।
- মোঃ রমজান আলী, গাউছিয়া সুন্নী যুব সংগঠন, কাদুঘর (দঃ পাড়া), বি-বাড়িয়া।
- মাওঃ গোলাম গাউস, ওলামেকপুর দরবার শরিফ, দারাপ্পা তুলপাই, কচুঁয়া, চাঁদপুর।
- আলহাজ্ব ডাঃ আনওয়ার হোসেন, গ্রাম+পোঃ হালিমপুর, রায়পুরা, নরসিংদী।
- ইসলামী ছাত্রসেনা, গ্রাম : বাগীতালিয়া, পোঃ অরুয়াইল, থানা : সরাইল, বি-বাড়িয়া।
- মাওলানা মুফতী ফারুক আহমেদ, তেজখালী দাখিল মাদ্রাসা, পোঃ তেজখালী, বাঞ্ছারামপুর, বি বাড়িয়া।
- পীরে তরিকত জামাল উদ্দিন মোমেন, কুতুবিয়া দরবার শরীফ, চৌধুরী বাড়ী, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
- মুফতি এম.এ. তাহের, অধ্যক্ষ, আবেদনগর দুগ্রিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, চাঁদপীর, লাকসাম, কুমিল্লা।
- মোঃ এরফান শাহ (ফারুক), দাঃ হযরত শিবপুর বড় পাটওয়ারী, পোঃ কাশিমপুর (দক্ষিণ), হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
- ক্বারী মৌঃ মোঃ তৈয়ব আলী, পশ্চিম জামে, বড় বহুলা, হবিগঞ্জ।
- মোঃ তাজরুল ইসলাম, পালের চক মোকামবাড়ী, আতগঞ্জ বাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট।
- খড়িয়ালা দরবার শরীফ, আশুগঞ্জ ষ্টেশন রোড, বি-বাড়িয়া।
- মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, মিরনীয়া চৌক, ডাম্পেগর বাজার, জাহেরপুর, সুনামগঞ্জ।
- মাওঃ মোঃ ইয়াকুব আলী বরনী, সভাপতি, সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ, বাজিতপুর, মিঠামন, কিশোরগঞ্জ।
- মোহাম্মদ ফাহিম কাদেরী, খাজা হার্ডওয়্যার চৌক, টি আর রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
- মুন্সী আঃ শুকুর, খানকায়ে গাউছিয়া ইউএম.সি. পুরাতন কলোনী, নরসিংদী।
- মৌলভী মোঃ ইছহাক, সাথীয়া ইলেকট্রনিকস, বোমনা বাজার, পোঃ বোমনা, কুমিল্লা।
- মাওলানা আবু সুফিয়ান আল-কাদেরী, কাদেরিয়া তৈয়বিয়া রেজাভিয়া মাদ্রাসা, বলখপুর, পোঃ হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
- বাদশা হেলাল, হেলাল মাইক সার্ভিস, থানাঃ শাহজাদপুর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
- মৌলভী শাহজাহান, গ্রাম ও পোঃ মজলের গাঁও সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
- মাওঃ আবুল কাসেম নূরী, বাগীবাড়, আখাউড়া, বি-বাড়ীয়া।
- মাওঃ আবদুল আজিজ, রতনপুর, পোঃ চাকলপাড়া, নাছিরনগর, বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ মোশারফ হোসেন মিয়াজী, সভাপতি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, মুন্সিগঞ্জ।
- মাওঃ আব্দুস সামাদ আজাদী, খতিব, গ্রাম মসজিদ জামে, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
- ডাঃ শহীদুল্লাহ, উপশম হোমিও হল, শিবপুরবাজার, নরসিংদী।
- মাওঃ সাইদুর রহমান সুন্নী আলকাদরী, খতিব বুধিরগাম পুরাতন মসজিদ, কলকার নম্বর, সোনারগাঁও, বায়েরগঞ্জ।
- কাজী আবদুল মালেক, হৃদয় ফার্মেসী, হরিমবোল বাজার, বাঞ্ছারামপুর বাজার, বি-বাড়ীয়া।
- মুফতি মোঃ তাজউদ্দিন, পানি উমদা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
- মুফতি বজলুর রহমান, অযুখা সিনিয়র মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।
- বারকাউনিয়া শাহজালাল (রহঃ) জামে মসজিদ, তিতাস, কুমিল্লা।
- আলহাজ পীর সৈয়দ নঈমউদ্দিন, দৌলতবাড়ী দরবার শরীফ, বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ আবু সুফিয়ান, প্রযত্নে সুজন চৌক, পোঃ চাপাপুর, কুমিল্লা।
- মোঃ আবু সুফিয়ান, মাওয়া ফেরীঘাট, মুন্সীগঞ্জ।
- মাহফুজুর রহমান, পাক হাজীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।
- গাউসিয়া সোবহানিয়া দাঃ মাদ্রাসা, ভুমুরিয়া, কচুয়া, চাঁদপুর।
- সনি আশরাফী, ফতেহ মোহাম্মদপুর, ঈশ্বরদী, জেলাঃ পাবনা।
- মোশারফ হোসেন, পীর কাশিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।
- মর্তুজা আলী, মর্তুজা চৌক চুনারুঘাট, জেলাঃ হবিগঞ্জ।

- MD. AHMED CHOWDHURY, 14. Bread Field Court, Hawley Road, Camdentown, London, NW1-8Rn U.K. Ph. 020728431??
- MD. AHAD MIAH, 124 Sand Well Street, Caldmore ,Walsall Wsl 3Eg West Midlands, U.K. Ph 01922-639817
- MR. MAKADDUS MIAH, All Seasons Dry Cleaning & Landuary 147/A Caldmore Road, Walsall, WSI 3RF Uk. Ph. 01922-62200?
- SYED MOSTAQUE MIAH, 41, Napier Street West Oldham, OL8 4AE Uk. Ph. 0161-6270119
- MR. ABDUL WAHID, 44-17-25 Th Ave (2Nd Floor) Astoria NY-11103 U.S.A. Tel : 718-6267695
- ALHAJ ANFORUL ISLAM, 56 A, Glen Burn Road, Kings Wood Bristol, BS15-IDP U.K. Ph. 01179610560
- MD. MUZIBUR RAHMAN, 95, Wills Street, Lozells, Birmingham, B19-2AL, Uk.
- SYED WAISUR REZA, 18, Normanton Drive, Lough Borough LE-11 INE, U.K. Ph. 01509264582
- MD. ANWAR MIAH, 152 Winsor Road, Off Country Road Hull, Hu5-4 HH, North Hamber Side, U.K. Phone : 01482-6578??
- MD. SAIFUR RAHMAN KHAN, Shiefield, S9-4Rb11 Tel : 0114-2610287/3
- S.M. HASSAN, 68, Parkfield St. RushLome ,Manchester
- SHUHELUL HAQUE, Southport, 01704380574
- M.A. HOSSAIN, 96, Normunt Rd. Fenham, New Castle Upontyne, NE4-8SH, Uk, Tel : 0191-226017
- CHOMOK ALI, 358 Stam Forth Road, (Darnall) Shefield S93Pu. U.K. Tel : 00114-242261
- SYED MOHAMMAD ALI, 24 Stubbington Avenue Northend, Portsmouth, Po2-OHT, Uk. Ph 02392662??
- ABUL KASHEM MALIK, 36 Priston Ville Road Brighton, BN1-3TJ Uk. Ph. 01273820628
- MR. SHAHABUDDIN, 101, Brook Drive, London SE11-4TU, Uk. Ph. 02077359744
- SYED MUQTASID, 32 Brougham St. Burnley, Lanc BB12-OAS, Uk. Ph- 01282-623138
- ASHIK UDDIN, 142 Nottingham Road, Loughboro LE11-1Ex, Uk. Ph 01509-269109
- MR. KHAIRUL BASHAR (SHAJ), 24 Albart Wall North Wool Wich, E16-2NI, Uk. Tel : 0207-473???
- MR. SALIK MIAH, 27,Nelson Road, Aston, Birmingham Ph
- ABDUL MALIK, 5 Deburgh Street Riverside, Cardiff Uk. Ph
- ZIAUR RAHMAN, Birmingham, B19-1HG, UK. Tel : 0121
- SM. MIZANUR RAHAMAN, Po Boox No 345, Burayd

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমীন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Websote: http:// Sunnibarta.wordp